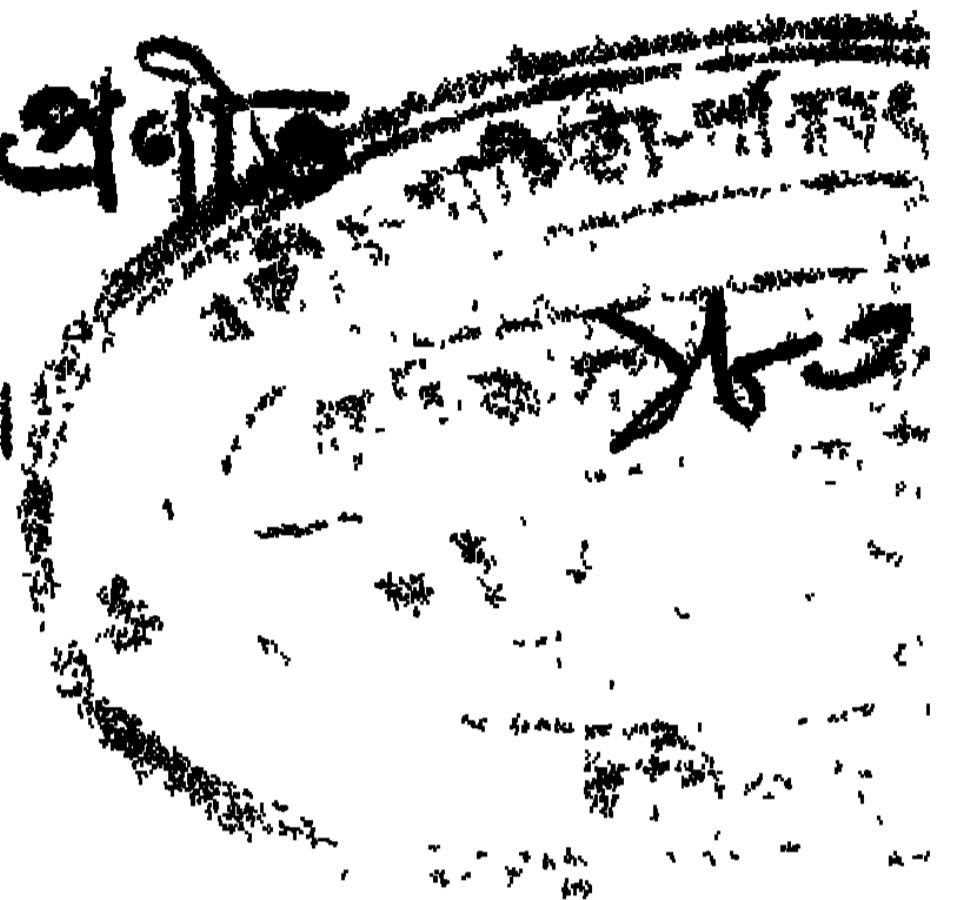


# কবিতাসংগ্রহ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

কবিতাবলী।



শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক  
সম্পাদিত।

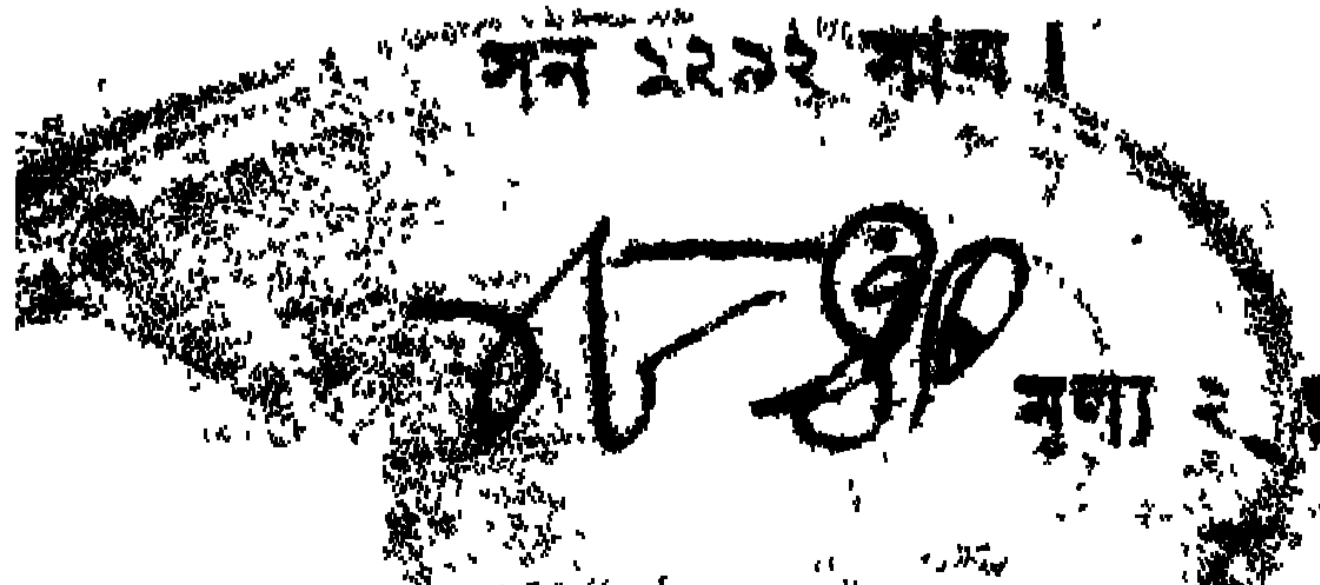
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১০ ১২ নম্বর জিদবাটী স্ট্রীটে সংবাদ প্রভাকর বঙ্গালয়ে

শ্রী কেদারনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ শকাব্দ।



মূল্য ২ হই টাকা মাত্র।



## বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গের লেখকাগনী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকীয়তায়, উত্তরসাহিত্য এবং তত্ত্বাবধানে কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লুপ্তপ্রায় কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন সূত্রে যদি ভাষার কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে, জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহা হইলে, সেই উপকার এবং গৌরব, বঙ্কিম বাবুর দ্বারা সাধিত হইল জানিয়া, জাতি, তাহার নিকট যে নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা-রূপে আবদ্ধ, তাহার উপর এই আর একটি ঋণ বাড়িল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা—বঙ্কিম বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্যে তাহার অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া দূরে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কি না সন্দেহ ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষার শিরে আর একটি সুরভিপূর্ণ কুমুম অর্পণ করিলেন ।

ঈশ্বরଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ନାନା ବିଷୟେ ପ୍ରାୟ ପঞ্চାଶ ସହସ୍ର କବିତା  
 ଲିଖିয়া ଗିয়াছেন । ତାହାର ମଧ୍ୟେ କତକଂଠି ପ୍ରକାଶ ହইଲ  
 ଯାତ୍ର । যদি ଏখାନି ଆଦরের ସହିତ ଗୃହିତ হয়, ତାହା ହইଲେ,  
 ଅବশିଷ୍ଟ କବିତାବଳୀ ଏବଂ ଈଶ୍ଵରଚନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରୀହାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିତେ  
 ପାରିବ, ଏମତ ଆଶା କରି ।

ଏତଂ ପ୍ରଚାରର ଲଭ୍ୟାଂଶ ଈଶ୍ଵରଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଗଣ ପ୍ରାପ୍ତ  
 ହইବେନ, ଅନୁଷ୍ଠାନପତ୍ରେହି ତାହା ପ୍ରଚାର ହইয়াছে ।

ଶ୍ରୀଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରକାଶକ ।

କଲିକାତା ।

ଆର୍ଯ୍ୟଟୋଳା

୫୦ ନଂ ଶହର ହାଲଦାରେର ଲେନ ।

୧୫ହି ଆଶ୍ଵିନ, ୧୨୯୨ମାଳ ।

# সূচীপত্র ।



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ ।

## প্রথম খণ্ড ।

নৈতিক এবং পরমার্থিক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
সব হ্যায় ফাক	১
সবতরপুর	৩
কিছু কিছু নয়	৫
ঈশ্বরের করুণা	৮
সাম্য	২১
মায়া	২২
কাল	২৬
শরীর অনিত্য	২৮
রোজসই	৩০
ভয়জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই ✓	৩১
পরমার্থ	৩৭
সংগীত	৪৭

বিষয়			পৃষ্ঠা ।
প্রণাম তোমার	...	...	৪৩
তব্ব	...	...	৪৬
খল ও নিন্দুক	...	...	৫০
মিশনরি	...	...	৫৩
বিষয়ে সুখ নাই	...	...	৫৫
নির্গুণ ঈশ্বর	...	...	৫৯
শ্রীমদ্ভাগবত	...	...	৬৬

## দ্বিতীয় খণ্ড ।

### সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক ।

ঈংরাজী নববর্ষ	...	...	৬৯
পৌষ-পার্করণ	...	...	৭৪
ছন্দ মিশনরি	...	...	৮১
পাঁটা	...	...	৮৩
বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্তি	...	...	৮৯
বড় দিন	...	...	৯২
নীলকর ( ৫ টা গীত )	...	...	৯৯

বিষয়			পৃষ্ঠা ।
ছুভিক্ষ ( দুইটা গীত )	...	...	১২০
আচার ভংশ	...	...	১৩২
বাবাজান বুড়া শিবের স্তোত্র	...	...	১৩৮

## তৃতীয় খণ্ড ।

### ঋতুবর্ণন ।

গ্রীষ্ম	..	.	৪১০
বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাচুর্য্যাব	...	...	১৫৩
বর্ষার বিক্রম বিস্তার	...	...	১৬৪
বর্ষার ধুমধাম	...	..	১৬৬
সুবৃষ্টি	...	...	১৬৭
বর্ষার আবির্ভাব	...	..	১৭০
বর্ষার অভিষেক	..	..	১৭২
বর্ষায় লোকের অবস্থা X	..	..	১৭৩
বর্ষার ঝড় বৃষ্টি	....	...	১৭৬
শরৎবর্ণন	...	...	১৭৭

বিষয়			পৃষ্ঠা ।
১২৫৫ সালে শরদের আগমনে			
লোকের অবস্থা বর্ণন X	...	...	১৯৯
শারদীয় প্রভাত	..	..	২০৪
শীত	...	...	২১০
বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভ এবং			
বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ...		...	২১৪
বসন্ত বিরহ X	...	...	২২০

---

## চতুর্থ খণ্ড ।

### যুদ্ধবিষয়ক ।

শীক সংগ্রাম	..	..	২২১
যুদ্ধের জয়	..	..	২২৩
দ্বিতীয় যুদ্ধ	..	..	২২৭
মুদকির যুদ্ধ	..	..	২২৯
যুদ্ধ	..	...	২৩০
যুদ্ধের জয়	...	..	২৩২



বিষয়	পৃষ্ঠা ।
কাবুলের যুদ্ধ	২৩৮
আফগানের সংগ্রাম	২৪২

## পঞ্চম খণ্ড ।

### বিবিধ বিষয়ক ।

কুমোর প্রতি রাধিকা	২৪৭
ভাব ও চিন্তা	২৫১
হাস্য	২৫৩
কালকন্ঠার সহিত বর্ষবরের বিবাহ	২৫৬
গিরিরাজের প্রতি মেনকা	২৫৯
বর্ষার নদী ✓	২৬৩
দ্বারকানাথ * * * মৃত্যু ✓	২৬৩
প্রেমনিরাশ	২৬৮
প্রেম	২৬৯
প্রেমের প্রথম চুম্বন	২৭০
প্রেম	২৭৩
প্রেমের আশা	২৭৬



বিষয়			পৃষ্ঠা ।
টোরি ও ছইগ ✓	....	....	২৭৮
প্রভাতের পদ্য	..	...	২৮১
কবি	..	..	২৮২
মাতৃভাষা	...	..	২৮৪
স্বদেশ	..	...	২৮৫

---

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত

ও

কবিত্ব

বিষয়ক

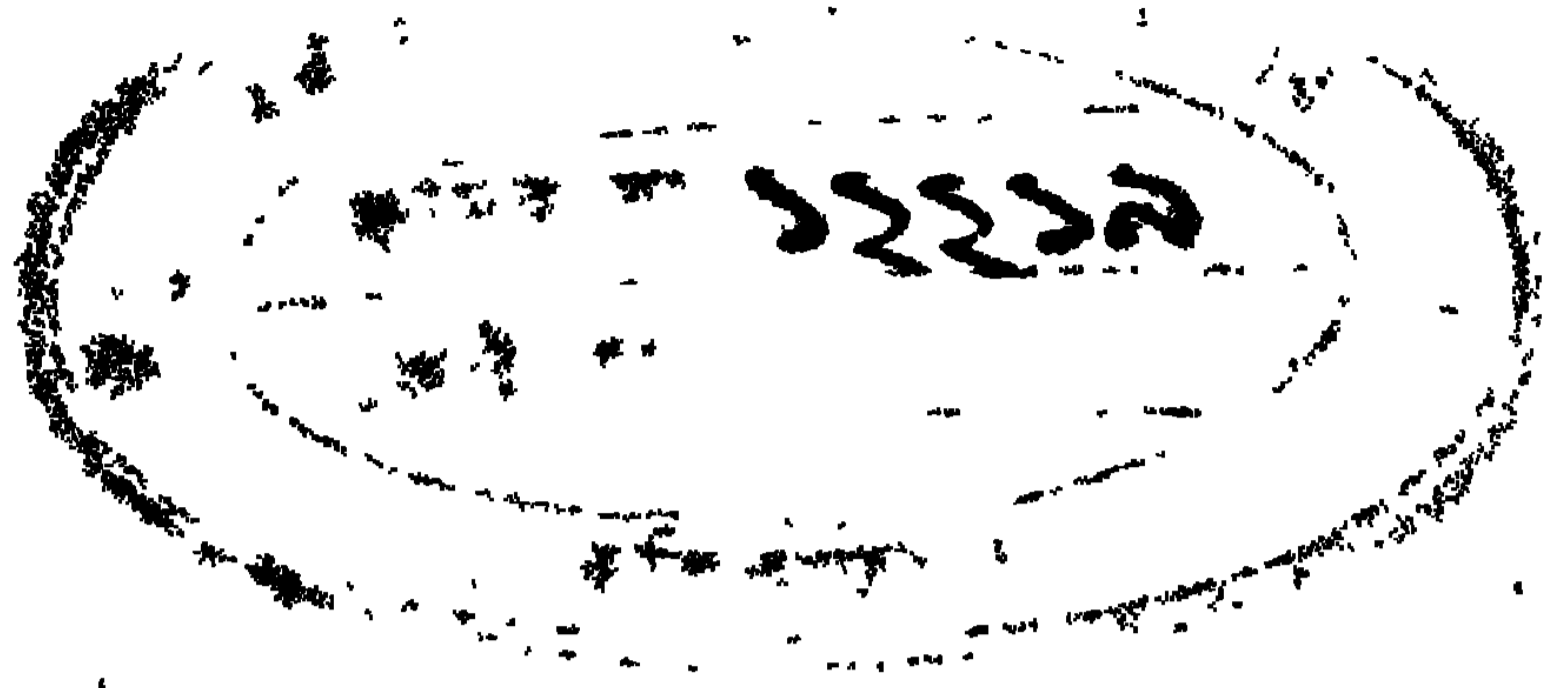
প্রবন্ধ ।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক

প্রণীত ।





## ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত

ও

কবিত্ব।

### উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালী সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিজ্ঞাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গালী সাহিত্য, কাব্য-রাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিন্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিনীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা

(ক)

## ২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে এ “কেলা কা ফুল ।”  
রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, যে এখন আমরা সকলেই  
মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি । তাই  
আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি ।  
আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা  
বলেন ।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া  
ছিলাম । প্রদোষকাল—শুক্ৰুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ  
ভাগিরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে  
তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটি-  
তেছিল ও নিবিত্তেছিল । যে বারেণ্ডার বসিয়াছিলাম  
তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মূহুরব  
করিয়া ছুটিতেছিল । আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকার  
আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি ! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল ।  
মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি ।  
ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ  
ভাগিরথীর ত কিছুই মিলে না । কালিদাস ভবভূতিও  
অনেক দূরে ।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল  
না । চুপ করিয়া রহিলাম । এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর  
সঙ্গীত ধনি শুনা গেল । জেলে জাল বাহিতে বাহিতে  
গায়িতেছে—

“সাধো আছে মা মনে ।

দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব,

জাহ্নবী-জীবনে ।”

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাক্সালা ভাষায়—বাক্সালীর মনের আশা গুণিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম । তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল ।

সেই রূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাক্সালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে । খাঁটি বাক্সালী কথায়, খাঁটি বাক্সালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না । তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এখানে সব খাঁটি বাক্সালা । মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাক্সালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাক্সালার কবি । এখন আর খাঁটি বাক্সালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই । বাক্সালার অবস্থা আবার কিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাক্সালী কবি আর জন্মিতে পারে না । আমরা “রক্তসংহার” পরিত্যাগ করিয়া “পৌষপার্বণ” চাই না । কিন্তু তবু বাক্সালীর মনে পৌষপার্বণে

যে একটা সুখ আছে—রক্তসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিশ্বাধর-প্রতিবিশ্বিত সুধার তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশ শুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষ গুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্ৰহ করিলাম।

এই সংগ্ৰহের জন্য বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ, ও পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যিক তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

একণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্ৰহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতক গুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সংকলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজের



স্বলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যনন্দনামারে সুপরিচিত । তাঁহার নোট গুলি এরূপ পরিপালি, যে আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি । প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবু নোট গুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই । তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্ত আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী ।

এই কথা গুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্ত আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র ।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

### বাল্য ও শিক্ষা ।

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাল্গালার ধাতুক্বেত্র মধ্যে যুক্তবেণী—  
কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথ-  
গামিনী হইয়াছেন । যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার  
পশ্চিম পারশ্বে গ্রামের নাম “ত্রিবেণী”—পূর্ব পারশ্চিত্ত  
গ্রামের নাম “কাঞ্চনপল্লী” বা কাঁচরাপাড়া ।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমার হট্টের দক্ষিণে  
গৌরীভা বা গরিফা । এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের  
বাস । এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাল্গালার মুখ উজ্জ্বল  
করিয়াছেন । গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র  
সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । কুমারহট্টের  
গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ । কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার  
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।\*

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের  
আদি পুরুষ । তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ ।

---

\* এই প্রদেশের বৈজ্ঞানিক রাজকাৰ্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি  
লাভ করিয়াছেন । নাম করিলে অনেকের নাম করা  
যাইতে পারে ।

## ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

৭

রামগোবিন্দের দুই পুত্র, ( ১ ) বিজয়রাম, ( ২ ) নিধিরাম । বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন । সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল । সেই জন্ত তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত । তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই ।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি কবি-ভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন । নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে, ( ১ ) বৈষ্ণানাথ, ( ২ ) ভোলানাথ, এবং ( ৩ ) গোপীনাথ ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরষে স্রীমতী দেবীর গর্ভে ( ১ ) গিরিশচন্দ্র, ( ২ ) ঈশ্বরচন্দ্র, ( ৩ ) রামচন্দ্র, ( ৪ ) শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র । তিনি ১৭৩৩ শকের ( বাঙ্গালা ১২১৮ সালে ) ২৫ এ ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরা-পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না ; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । পৈত্রিক ধানক্ষেত্র, পুকুরিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে

## ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

এই একান্তভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না । সমাজ মধ্যে এই গৃহস্থেরা মাথু গণ্য ছিল ।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ভাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট সেয়ালদেহের কুটিতে মাসিক ৮ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন ।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম । ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননী সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন । মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম করিতেন । মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না ।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় ভরস্তু ছেলে ছিলেন । সাহসটা খুব ছিল । পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমবশ্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন । অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার যাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল । সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

“কেরে?—কে যায়?”

“আমি—ঈশ্বর ।”

“একেলা এই অন্ধকারে অমাবশ্যার রাত্ৰিতে কোথায় যাইতেছিস?”

“ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে ।”

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগলকুঁড়িরায়  
বসিয়া কবিতা লেখা !

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার  
মাতার মৃত্যু হয় ।

স্ত্রীবিয়োগের কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারা-  
য়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন । তিনি বিবাহ করিয়া  
শ্বরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্যস্থলে গমন করেন ।  
নব বধু একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারা-  
য়ণের বিমাতা ( মাতা জীবিতা ছিলেন না ) তাঁহাকে বরণ  
করিয়া লইতেছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে বাহা করিয়া-  
ছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে । ঈশ্বর  
চন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিস বড় ভাল  
বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু । এই সংগ্রহস্থিত কবিতা গুলি  
পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড়  
শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতে  
ছেন—গবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও  
মাক নাই । এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির  
প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ । খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—  
তাঁহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল । মেকির  
শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা কল  
লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি  
নির্দেপ করিলেন । কবিপ্রযুক্ত কল সৌভাগ্যক্রমে,

## ১০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা তাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিঁধিয়া গেল ।

অল্প ব্যর্থ দেখিয়া কীরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলেন । কিন্তু বরদানার্থ পিনাক হস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেষ্ঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত । জ্যেষ্ঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাড়কা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন ।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই । তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয় । ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অক্ষয় তীব্র জ্বালা-বিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল । কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন । ইংরেজ সমাজ বাররণকে প্রসিদ্ধিত করিয়াছিল—বাররণ, ডন জুরানে তাহার শোধ লইলেন ।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সাস্বনা করিয়া বলেন, “তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল । তোদেরি দেখিবেনিবে ।”

আবার মেকি ! জ্যেষ্ঠা মহাশয় বা হোক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ

স্বহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ হইল না। ঈশ্বর চন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—

“হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখেছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন।”

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ার বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে ঈশ্বর চন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হইলেন। সেই পীড়ার তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আরক্তি করিতে থাকেন —

“রেতে মশা দিনে মাছি,

এই তাড়য়ে কলুকেভায় আছি।”

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ফুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে

সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনা শক্তি ছিল। বীজ গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা রচনার তৎপর ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্ব ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অনবস্থের জন্ম কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্রাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেডিক বাপের অবাধ্য বয়স্টে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিন্তু দস্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।



মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলদালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন । কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনার বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না ।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি । লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনার মন । রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা । এই সকল ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যে টুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয় । ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শুনার, অমনোযোগী হইতেন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন । তাঁহার গদ্য রচনার তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে । কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয় । তিনি মুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কাব্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত । আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগরের স্থায় মুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই

বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জিত কবির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম?

তুমি হে আমার বাবা ছাড়া আত্মারাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতিশীলের গম্পা শুনিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, “কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড় মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?” স্মৃশিকার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড়

পাড়িও না । মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি । ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—শুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না ।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল । একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না । কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ভেদ্য শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পর তাঁহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৩ সালের ১লা বৈশাখে সিংহবাদ প্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

“ঈশ্বর বাবু দুষ্কপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন । যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্ত শাস্ত্র পাঠ করিত । তাহাতেই যে দুই একটা পারস্ত শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বহু শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষার মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন । ১১। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যন্ত পরিভ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারণ হইয়া-

## ১৬ . ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

ছিলেন যে, মথুর দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চন-পালীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদীদল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান হরার প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন ।”

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্ত-ব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিজ্ঞানসূত্র-<sup>১</sup> জীবিকান্বেষণ জন্ত কলিকাতায় আগমন করেন । মাতারাম হিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহি মৃত্যুর আশঙ্কায় সঞ্চারণ হয়, তখন আয়ারও পাঠদশা, তি-<sup>২</sup> আয়ার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, কেবল বিজ্ঞানভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম । আমি সে সময় সর্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটা অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত । অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অনলীলাক্রমে অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়া সহস্র সূত্র সমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন । কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই ।”

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭/১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র

সহবাস থাকাতে আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুগ্ধ ও অর্থের সহিত কণ্ঠ করিয়াছিলেন। ঋতিধরদিগের প্রশংসা অনেক ঋতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত ঋতিধরতা সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অগুরুতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্র হু হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।”

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতার আসিয়াই ঠাকুর বাড়িতে পরিচিত হইলেন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাবানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবি সৌভাগ্যের এবং যশকীর্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুর বাণীতে মহেশ চন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকেৱ ছিট থাকার লোকে তাঁহাকে “মহেশা পাগলা” বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুর বাণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অধ্বাঙ্গ নহে—কবির সহধর্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romance ও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটা পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের

বিবাহ দেন । ঈশ্বরচন্দ্র . পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম করিব না । কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতী-নের ঝগড়ার মধ্যে গড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি । ভরসা করি আধুনিক বয়স কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃ মাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন ।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চির-কাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিয়া, মৃত্যু-কালে তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন । দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন । কয়েক বৎসর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব ? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না । যে আশুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আশুণ তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না । ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতার দেখিতে পাই । অনেক দাঁহ করিয়াছে দেখিতে পাই । যে শিকাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই । যে উন্নতি স্ত্রীলোকের

## ২০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

সংসর্গে হয়, জীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। জীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিগে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেদান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের মুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার জীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নারিকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত “মানভঞ্জন” নামক বিখ্যাত কাব্যের নারিকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। জীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত জীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের আয় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্ম দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম ? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম ।

১২৩৭ সালের কার্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরি-নারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতার আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটতেই প্রতিপালিত হইতেন।



পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জন আবশ্যক হইয়া উঠে । জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্বেই মরিয়া-  
ছিলেন । রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের  
উপরই অর্পিত হয় ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কর্ম ।

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ ।  
সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া ; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা  
সরস্বতীর বিষনরনে পতিত । কথাটা কতক সত্য হইলেও  
হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ  
নাই । বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত দেখিতে পাই  
লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায় ।  
লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া  
রাখিতেন ; নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শ্বে  
অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—  
তাঁহার পালিত গর্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠি-

তেন না। এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণার ঝঙ্কার দিতে-ছেন দেখিতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন—সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটী কিছু নাই; অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনার প্রথম প্ররক্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়ে অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। ইহার পূর্বে ৩ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) “বাঙ্গালা গেজেট”—১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) “সমাচার দর্পণ”—১২২৪ সালে জীরামপুরের মিশনারিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামনোহরী রায়ের উদ্যোগে “সংবাদ-কৌমুদী” প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে “সমাচার

চন্দ্রিকা”, (৫) “সংবাদ তিমিরনাশক” এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্তৃক “বঙ্গদূত” প্রকাশ হয় ।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্র মোহনের সাহায্যে উৎসাহে এবং উজোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৩ই মাঘে “সংবাদ প্রভাকর” প্রচারারম্ভ করেন । তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত ।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, “৬ বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয় । তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না । চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত । ৩৮ সালের আষাঢ় মাসে পূর্বেকৃত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায় । তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সমুদায়ের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল ।”

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্যা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় । কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্যা লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন; ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

“শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৩ বাবু নন্দ-  
লাল ঠাকুর, ৩ বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৩ বাবু নন্দকুমার ঠাকুর,  
৩ বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু  
প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৩ হালিরাম চৌকিয়াল ফুকন, শ্রীযুক্ত  
জয় গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ,  
বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৩ কৃষ্ণচন্দ্র  
বন্দু, বাবু রসিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত,  
বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য ।  
শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের  
অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর  
সাহায্য করিতেন । তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় \*  
অন্যাবশি প্রভাকটরর শিরোভূষণ রহিয়াছে । জয়-  
গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য

\* সত্যং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ

সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ ।

উদেতি ভাস্বংসকলাপ্রভাকরঃ

সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেঘিন্দীবরেষু

কচিদ্ভু মং ভ্রাম মতশ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।

অদ্যোত্মদ্বিমল প্রভাকরকরশোভিত্রিপদ্যোদরে

অক্ষয়ং দিবসে পিবন্তু চতুরাশ্বাস্তুদ্বিরেকারসং ॥

পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।”

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কাৰ্ত্তি । মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনৰ্দ্ধিত হইয়া অত্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন । বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী । মহাজন মরিয়া গেলেন খাদক আর বড় তার নাম করে না । ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না । কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন । প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান । ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেকস্থলে তিনি ভারত চন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে । নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায় । আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনারি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন । আর ঈশ্বরগুপ্তের নিজের কীৰ্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীৰ্ত্তি আছে । দেশের অনেক গুলি লক্ষপ্রতিষ্ঠ

## ২৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন । বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় এক জন । বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন । শূনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন । ইহার জন্তও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী । আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী । আমার প্রথম রচনা গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয় । সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন ।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয় । ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, “এই সময়ে ( ১২৩৯ সালে ) জগদীশ্বর আমাদের কৰ্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন । স্মৃতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপৰ্য্যাপ্ত শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগ-শূন্য হইলাম । তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ যেহা-চ্ছন্ন হওন জন্ত এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন ।”

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণে খ্যাতি

লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২০৯ সালের ১০ই আবেণে “সংবাদ রত্নাবলী” প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হইলেন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বর চন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহের যে ইতিহাস প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, “বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে “সংবাদ রত্নাবলী” আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক ৮ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।”

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, “কলতঃ গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদ্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে ক্রীকেন্দ্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পূজ্য-নীর ত্রিযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের স্নদনে

## ২৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন । এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন ।”

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন । তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্ত চেষ্টিত করেন । তাঁহার সে বাসনাও সফল হয় । ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্বরূতান্ত প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, “ ১২৪৩ সালের ২৭ এ আশ্বিন বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্বার বার্ত্তনিক রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কৰ্ম সম্পাদন করিতে পারি, আশাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না । জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কৰ্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাই লাল ঠাকুর, এবং তদনুজ বাবু গোপাল লাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যরোপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আশাদিগের আবশুক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রমী করেন না । এ কারণ আমরা উল্লিখিত জাতীয়দের পরোপকারিতা গুণের ধর্মে নিমিত্ত জীবনের সুখী কাল পর্য্যন্ত দেখকে বন্ধক রাখিলাম ।”

সম্প্রকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমু-



জ্ঞান হইয়া উঠে । নগর এবং গ্রাম্যপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্যাগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন । কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকর প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন । ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক ।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম ;—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরী-শঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপাল কৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দ চন্দ্র সেন, ধর্মদাস পালিত, বাবু কানাই লাল চাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক ।” ;

## ৩০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

“সীতানাথ ঘোষ, গণেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বাদব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপাল চন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, জীনাথ শীল, এবং শঙ্কুনাথ পণ্ডিত ইহঁরা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেকের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন ।”

“শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঞায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ঞায় তাবৎ কর্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইহঁাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরিক্ত মাত্র । বিশেষতঃ শেবোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা নমুদয় কর্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন ।”

“রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় অক্ষয়দ্বিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহঁার সঙ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব ! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া স্বদয় বিদীর্ণ করিতেছে । যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ঞায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিভ্য ব্যাপারে ইহঁার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে । কবিতা নর্তকীর ঞায় অভিজ্ঞানের বাদ্য তালে ইহঁার মানসরূপ নাট্যশালায় নিরন্তর হৃত্য করিতেছে । ইনি কি গাঢ় কি পদ্য উত্তর রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন ।”

“ ঠাকুরবংশীর মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাল লাল ঠাকুর, “ চন্দ্রকুমার ঠাকুর ” নন্দালাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মধুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত রূপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন। ”

“ এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশ চন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্ম আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাভ্যাসের মহানুভব বাবু কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কালী প্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র নাহিড়ী, বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠ নাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের

## ৩২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

পত্রের সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্ন লইয়া  
আছেন ।”

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্য-  
কারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে । বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত  
সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং  
কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন । মূল্যদানে  
অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর  
দান করিতেন । তাহার সংখ্যাও ৩৪ শত হইবে । উত্তর  
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহক  
শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিরন্তর স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠা-  
ইতেন । সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা  
সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন ।  
প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদ পত্র সমূহের শীর্ষ-  
স্থান অধিকার করিয়া লয় ।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষওপীড়ন” নামে এক  
খানি পত্রের সৃষ্টি করেন । ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের  
প্রভাকরের সংবাদ পত্রের ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া  
গিয়াছেন, “১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে  
প্রভাকর যখন “পাষওপীড়নের জন্ম হইল । ইহাতে পূর্বে  
কেবল সর্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত,  
পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষওপীড়ন,  
পাষওপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষও হস্তে পীড়িত

হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃত্রিম ব্যক্তি  
যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধাৰ্মিক ঘোষ  
বিপ্লবের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে  
পাশুপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং  
আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ  
ঘোষ উক্ত পত্র ভাঙরের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া  
নষ্ট করিল।”

সম্বাদ ভাঙর-সম্পাদক গোঁরী শঙ্কর তর্কবাগীশের  
সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল।  
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া  
গিয়াছেন, “সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাঙর সম্পাদক তর্কবাগীশ  
মহাশয় পূর্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য  
করিতেন, এক্ষণে সময়ভাবে আর সেরূপ পারেন না।”

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুন-  
রার লেখেন, “ভাঙর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই  
ক্ষণে যে গুপ্তের কার্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে  
কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্বং পত্রের আনুকূল্য করিতে  
পারেন? তিনি ভাঙর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে  
নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই  
তঁাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের  
বিষয় এই যে, সম্পাদকের বেঁ বখার্ব ধর্ম, তাহা তঁাহা-  
তেই আছে।”

## ৩৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয় । ঈশ্বরচন্দ্র “পাষাণ পীড়ন” এবং তর্কবাগীশ “রসরাজ” পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন । শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, মানি, এবং কুংসাপূর্ণ কবিতার পরম্পরে পরম্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন । দেশের সর্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে । সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয় ।

কিন্তু দেশের কচিকে বলিহারি ! সেই কবিতা যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই । দৈবাধীন আমি একসংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়া ছিলাম । চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না । মনুষ্য ভাষা যে এত কদর্যা হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না । দেশের লোকে এই কবিতা যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন । বলিহারি কচি ! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতার জ্বালা-তন হইয়া, লং মাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য হইলেন । সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালী সাহিত্যে দেখা যায় না ।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ হুজ্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল । সেটা ভ্রম । তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ার শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে

গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে কল্যাণ্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই কল্যাণ্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল,—

“প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায় ?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন ?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবারীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন ?

উ। কে লিখিবে ? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন ?

উ। একমাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উত্তর সম্পাদকের

## ৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ  
রহিল ।”

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক  
পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪ এ মাঘ প্রাণত্যাগ  
করেন ।

পাশুপাড়া উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে  
ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন” নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র  
প্রকাশ করেন । এখানিতে তাঁহা ছাত্রমণ্ডলির কবিতা ও  
প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত । “সাধুরঞ্জন” ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর  
কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল ।

অসুস্থতায় হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের  
অনেকগুলি সভার নিযুক্ত হইয়াছিলেন । তত্ত্ববোধিনী সভা,  
টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, দর্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির  
সভাপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং  
কবিতা পাঠ করিতেন । তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার  
দিনে বাঁচিয়া নাই ; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত  
হইতেন । রামরঙ্গিনী, শ্যামতরঙ্গিনী, নববাহিনী, ভবদাহিনী  
প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ  
নাই । কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে ।  
গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঙ্গিনী সভা, হাটে হাট-  
ভঙ্গিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিনী, ঘাটে ঘাটসাধনী-জলে জলতরঙ্গিনী,  
স্কুলে স্কুলশারিনী--খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে



বিষয়সিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে ।

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাচ-  
 তাঁর । এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল  
 কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিগে কবির  
 দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাধিতেন । নগর এবং  
 উপনগরের মথের কবি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের  
 সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত  
 হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন । অনেক স্থলেই তাঁহার  
 রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত । মথেরদল  
 সমূহ সর্বত্রই তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে  
 পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না ।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটী নূতন অস্থান করেন ।  
 নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে  
 একটী মহতী সভা সমাহৃত করিতে আরম্ভ করেন । সেই সভার  
 নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং  
 সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া  
 উপস্থিত হইতেন । কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ,  
 দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত  
 বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন । বাবু দেবেন্দ্র-  
 নাথ ঠাকুর প্রভৃতির স্তায় মাণ্ডগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন  
 গ্রহণ করিতেন । ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং

## ৩৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

কবিতা পাঠ করিয়া, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন । পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে বাহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাহারা তাহা পাঠ করিতেন । যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন । নগর ও ও মফস্বলের অনেক সম্রাটলোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন । সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ্য দিতেন ।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাথে কবিতা লিখিতে পারিতেন না । সেই জন্তই তিনি ১২৬০ সালের ১ লা তারিখ চইতে এক এক খানি স্থলকায় প্রভাকর প্রতিমাসেব ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন । মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন ।

প্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হইলেন । কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন । সহকারী সম্পাদক বাবু শ্রীমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন । মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন । শেষ

অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের শেষ পর্য্যটনে বিশেষ অমুরাগ জন্মে, সেই জন্মই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতার থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনামা দর্শনে কবিতা প্রণয়ন পূর্বক প্রত্যেক প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। ঝাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণ-কালে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, মফস্বলের ধনবান জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং মানা-বিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন। ঝাঁহারা সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে

নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন । তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন । ইচ্ছাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না । বালকদিগের অবিভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ক্রটি করিতেন না । ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন ।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত মুণ্ডপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান পর্য্যটন, এবং নথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন । বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী । সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকণ্ঠে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত “ কালীকীর্তন ” ও “ কৃষ্ণকীর্তন ” প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি মুণ্ডপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন । তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন ( নিধুবাবু ), হরঠাকুর, রামবন্দু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাস্ত্র ও জুসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন প্ৰখ্যাতনানা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ

করেন । সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বাইতে পারেন নাই ।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক-লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন । সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন । ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে “ প্রবোধ প্রভাকর ” নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয় । পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়ন কালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন । উক্ত সনের ১লা চৈত্রে “ প্রবোধপ্রভাকর ” স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয় ।

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমাগত “ হিত-প্রভাকর ” এবং “ বোধেন্দুবিকাশ ” প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন । ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বাইতে পারেন নাই । তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে “ হিতপ্রভাকর ” ও “ বোধেন্দুবিকাশের ” প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন । তিন খানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে ।

কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা “ নীতিহার ” নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন ।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করি-

## ৪২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

রাছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যা় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপযুক্ত পরি কল্পখানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টাই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র অরোগে আক্রান্ত হইলেন। শেষ তাহা বিকাবে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয় ;—

“অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমারদিগের সর্বাধ্যক্ষ কবি-কুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্নানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সহপুত্র গুণযুক্ত এতদেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্বারা শারীরিক গ্নানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হইয়াছে।”

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্রাট লোকেরা

এবং মিত্রমণ্ডলী ছুঁখিতান্তুকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্ভিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পর দিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপর দিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই চুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুইপ্রহর এক ঘটিকা কালে ৬ ভাগিরথীতীরে নীরে সজ্জনে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।” •

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই

পরিচ্ছেদ শেষ করিব । ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্ত-  
গঠিত ।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অমুজ রামচন্দ্রের সহিত  
পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন । একদা সেই সময়ে রাম-  
চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “ ভাই ! আমাদের মাসিক ৪০ টাকা  
আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে । ” শেষ প্রভাকরের উন্নতির  
সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের  
শ্রায় আয় হইতে থাকে । প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা  
আসিত । ভদ্র্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই  
বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন । একদা অমুজ রামচন্দ্রকে  
অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “ আমি এক  
দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ  
টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোমার দশা কি হইবে ? ”  
বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল ।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না । পাত্ৰাপাত্ৰ  
ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যার্থী যাত্রকেই দান করিতেন ।  
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট কাতারাত করি-  
তেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান  
ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন । পরিচিত বা  
সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদ্রূপেই তাহা  
প্রদান করিতেন । কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা  
আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না । এই স্বত্রে তাঁহার



অনেক অর্থ পরহস্তগত হয় । সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাব পত্র ছিল না । ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন । তাহার রসিদপত্র লইতেন না । তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকাগুলি আয়সাৎ করেন । রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই ।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অব্যাহত ছিল । দুইবেলাই ক্রমাগত উচুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত । তিনি প্রায় মধ্যো মধ্যো ভৌঁজের অন্নুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন । তৎসমস্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত । একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, “শালগুলি ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন ; বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে । আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব ।” ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শাল তাহাকে দিলেন । কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্বৃত্ত, অবাধ্য এবং

## ৪৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

স্বৈচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধিসহকারে সে সকল দোষ যায় । তিনি সদাই হাস্যবদন, মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত । রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল । কপটতা, ইলনা; চাতুরী জানিতেন না । তিনি সদালাপী ছিলেন । কথায় হটক, বক্তৃতায় হটক, বিবাদে হটক; কবিতায় হটক, গীতে হটক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন । সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন । শক্রাও তাঁহার ব্যবহারে যুগ্ম হইত ।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না । পানদোষ ছিল । প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত । যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন । কাহাকেও নিরাশ করিতেন না ।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন ।—

এক(১)ছই(২)তিন(৩)চারি(৪)ছেড়ে দেহ ছয়(৬) ।

পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয় ॥

---

(১) কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ (৬) মঃৎসর্ষা (৫) মদ । “ রিপু রিপু নয় ” অর্থাৎ “ মদ ” শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না ।

তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ\* সেই অতি পরিপাটি ।  
 রাবুসেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥  
 পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে চোলে মারি কাটি ।  
 ঝোলমাথা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি ॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এ অল্প লোকে নিন্দা করিত । তাই  
 ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়ি  
 তেন । ঐকু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন ।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক  
 স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমু-  
 জ্জল । তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কাস্তিবিশিষ্ট ছিলেন । কথার স্বর  
 রত্ন মধুর ছিল । আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে  
 একটু গভীরভাবে কথাবার্তা করিতেন—তাঁহার কতকগুলি নন্দী-  
 ভঙ্গী থাকিত—রসাতলাবের ভার তাহাদের উপর পড়িত । ফলে  
 তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না । স্বপ্রণীত  
 কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন । আমরা বালক  
 হইলেও আমাদেরকেও শুনাইতে যুগা করিতেন না । কিন্তু  
 হেমচন্দ্র প্রভৃতির স্থায় তাঁহার আনুভূতিশক্তি পরিমার্জিত ছিল  
 না । যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে  
 তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি । কবিতা  
 রচনার অল্প দীনবন্ধুকে, ষারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে  
 একবার প্রাইজ দেওয়াইয়া ছিলেন । ষারকানাথ অধিকারী  
 কলকাতার কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান ।

তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেখী কথায়, দেশীভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন । অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয় । জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন । দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছে—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি ।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিনাসী ছিলেন না । সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন । যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজ সজ্জা কিছুই করিতেন না । বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিছা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না । সম্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন ।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

### কবিত্ব ।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি । কিন্তু কি রকম কবি ?

ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত । শাস্ত্র-বেত্তারা সকলেই “কবি ।” ধর্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি ।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত ঘটি-  
য়াছে । “কাব্যেযু মাধঃ কবিঃ কালিদাসঃ” এখানে অর্থটা  
ইংরেজি Poet শব্দের মত । তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে  
“কবির লড়াই” হইত । দুইদল গায়ক জুটিয়া ছন্দো-  
বন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন । সেই রচ-  
নার নাম “কবি ।”

আবার আজ কাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পারা যায়,  
কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে আজ কাল বড় গোল । ইংরেজিতে  
বাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব । এখন এই অর্থ  
প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা  
বিচার করিতে বাধ্য ।

## ৫০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না, যে এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অক্ষুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের গায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরুণীসেন বধ, যুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় বন্ধার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিত্তয় তিনি রাখা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে, যে তাঁর অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা

উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অক্ষুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন. ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্ত এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এই খানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নর কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা মহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অশ্রু তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্বণে পিটাপুলি খাইরা অঙ্গীর্ণে হুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যো নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ পিলিয়া, গাঁদাকুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ

তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। ছুতিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—  
তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে

ভাঙ্গা মন আর গড়েনা কো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পাদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উত্তুন গোড়ায় বসাইয়া, ষাণ্ডী ননদের গঞ্জনার ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটা কাব্য রস বাহির করেন;—

বধুর মধুর ধনি, মুখশতদল ।

সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল ।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটার, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির খজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি 'আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য রস পান, তপসেমাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীটির গানের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এদেশ, এসমাজ বড় রক্তভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া ছুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রক্ত দেখি—তোমরা এ ওকে কাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাঠ হাসি হাস, এখানে মিছা কাগা কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া



দেখিয়া হাসি । তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্মের ভাণ্ডার ;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস । মানুষে যেমন রূপী বাদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই মুখ ।” জীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা । তিনি জীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন । মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্ত কবি রূপ দেখিবার জন্ত, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্ত যান । তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিল-ধৌত কবিতকাস্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, “দেখ—দেখি ! কেমন ভায়াসা ! যে জাতি স্নানের সময় পরি-ধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর !” তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, “ধন্য স্বামীপুত্রসেবাব্রত ! ধন্য জীলোকের মেহ ও ধৈর্য্য !” ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্কণেই গেল, পিটুলির জন্ত কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে খাণ্ডী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুখভোজনের সময়

## ৫৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল । স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist । ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিতীয় ।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্রোহপ্রসূত । ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গ-কুশল লেখক জন্মিয়াছেন । তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ । পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—হৃয়ের কাজ মানুষকে হুঃখ দেওয়া । ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে । ছতোম পেন্টার নক্সা বিদ্রোহপরিপূর্ণ । ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্রোহ নাই । শক্রতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না । কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না । মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ । কেবল ঘোর ইয়ারকি । গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না । সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষার পরাজয় করিতে হইবে এই জিদ । কবির লড়াই, ঐরকম শক্রতাশূন্য গালাগালি । ঈশ্বর গুপ্ত “কবির লড়াইয়ে” শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল ।

অন্যত্র তাও নহ—কেবল আনন্দ । যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, হুই

জনে একটু হাসিবার জন্ত । কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার  
পাইতেন না । গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর, কোন্সি-  
লের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া  
নাই । এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার  
রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে । তাতে আবার  
পাত্ৰাপাত্ৰ বিচার নাই । যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে ।

আমাদের সে সাহস নাই । তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর  
নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের চেরা সই রহিল—

সিন্দুরের বিদ্ধসহ কপালেতে উক্তি ।

নসী জশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্কী ॥

মহারানীকে স্তুতি করিতে করিতে দেণী Agitatorদের  
কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি যা করতরু, আমরা সব পোষা গোকরু,

শিখিনি সিং বাঁকানো,

কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস ।

ষেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মাংলা,

গামলা ভাঙেনা ।

আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,

ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা ধাইয়াছেন—  
একটা নমুনা—



অথবা পাঁটা—

সাধ্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে ।  
 আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে ॥  
 হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে ছুটি ঠ্যাঙ্গ ।  
 সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ ॥  
 এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা ।

নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা ॥

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, “নস্যলোসা দধি চোসার” দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনারি-দের ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। যথা স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন।

কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন রূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারিনা । ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে । যাহা ইচ্ছিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্ত লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা । তাহা পবিত্র সত্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল । আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা কুচি এবং সত্যতার বিরুদ্ধ হইলে ও অশ্লীল নহে । ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন । সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল । আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাশ্রমী, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সত্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই “বদ্ভোবান” আরম্ভ করিতেন । তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল । কলে সে সময় ধর্ম্মাশ্রমী এবং অধর্ম্মাশ্রমী উভয়কেই অশ্লীলতার সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাশ্রমী । যিনি ইচ্ছিয়াস্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাশ্রমী । সৌভাগ্যক্রমে, সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে ।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাশ্রমী, কিন্তু সেকালে বাঙ্গালী । তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল । সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর

গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—স্বধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্ককোর তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অল্পকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়মান ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুকুর বা মর্কট বক্রবে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেরী ধারণ করিয়াও খালি পায়ের বর্ষার কাদা ভাজিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া হুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না।

জ্যোষ্ঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্ত তুলিয়া রাখিয়া ছিলেন । এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন । সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ কদর্যের উপর কদর্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত । বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্য—যে ছুরাঝা, তাহার জন্য এই কদর্য ভাষা । এই রূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে ।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাহার কবিতায় আছে । কেবল রঙ্গদারির জন্ত, শুধু ইয়ারকির জন্ত এক আধটু অশ্লীলতাও আছে । কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায় । সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না । যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না । যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না । যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না । তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল । চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল । তখন গুজা পার্কণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার । যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাকআকড়াই অশ্লীলতার জন্তই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত



সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্ধিত । অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটু খানি মার্জনা করিতে পারি ।

আর একটা কথা আছে । অশ্লীলতা সকল সভ্য-সমাজেই ঘৃণিত । তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না । আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না । ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই । আমরা ধুতি, পারছামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না । মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই । পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচূষনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার । কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্বাহ পাইয়া থাকে । এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি । দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি । শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচূষনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ ! আলতাপরা মলপরা পা ! দর্শনে' বিশেষ আপত্তি । ইহাতে

আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতার কালিদাস কোন পর্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিকৃত। স্তন বিলাতি রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয় ত ইহা গুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী মুখচুষন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, মেহ করিয়া “মাতা বসুমতী” বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃ স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনার তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাঙ্গালীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোয়ার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর বাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব

লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল ! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা ! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ । আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্যা, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নাই। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজেকে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা

কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ । কবিতা দর্পণ  
নাম—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে । দর্পণ  
বুঝিয়া কি হইবে ? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া  
তাহাকে বুঝিব । কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের  
হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব । কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া  
গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া  
গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে । তাহাই জীবনী ও সমালোচনা-  
দত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন  
অশিক্ষিত যুবা কলিকাতার আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে  
আধিপত্য সংস্থাপন করিল । কি শক্তিতে ? তাহাও দেখিতে  
পাই—নিজ প্রতিভা গুণে । কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে,  
প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই । প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন । সে  
মেঘ কোথা হইতে আসিল ? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে । এখন  
ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও সুরুচি  
পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি । ঈশ্বর গুপ্তের  
বেলা তাহা ঘটে নাই কেন ? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া  
দেখিতে হইবে । তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের  
রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম । বুঝাইলাম যে  
পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, ( ১ ) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার  
অবস্থা, ( ২ ) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, ( ৩ ) সহ-  
ধর্ম্মিনী, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাহার

পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং  
তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে  
প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার  
জন্ম। স্থূল তাৎপর্যা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন  
কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও  
কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ  
প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্বাকে বুঝাইবার জন্য  
আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে  
সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে,  
নমঃ নমঃ বলিয়া ছুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অুভি-  
প্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটা কে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা  
না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি.  
ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের  
আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতার ঘোর আয়োদ, ইয়ারকি  
ভরা,—পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু  
দিয়া আনারসের পরমভক্ষ, সুরাপান \* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার  
বিলাসী কারে বলে ? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

\* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনায় আমিও কোন কারণ  
দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারত-  
বর্ষের শ্রেষ্ঠ কাব্য এই উক্তিটা স্মরণ করিতে বলি—

একোহি দোষো গুণসঙ্গিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেধিবাকঃ।

## ৬৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সে গুলি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সে গুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেক গুলির মধ্যে ঐ কয়টা বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্য পদ্যে বহু লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয়, যে পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিয়াসী নামাবলীধারিতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে স্বার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্তিমান পিতা

বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে  
বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে  
বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—  
উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাঁধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার  
ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা  
'নায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মূর্তিমান ঈশ্বর  
সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া,  
তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া কাটাঠিয়া  
দিতেছেন। বাপ নিরাকার নিগুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ  
মূর্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে  
কষ্ট হইত। \*

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সম্মান ।  
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥  
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান ।  
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান্ ॥  
সর্বদিকে সর্বলোকে, কত কথা কয় ।  
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥  
হায় হায় কব কার, ঘটিল কি জালা ।  
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হলে কালা ॥

---

\* এই সংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর ।

মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া ।

অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান ।  
ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র ! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই ।  
আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নছি ।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত  
করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর  
করিবেন না । এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার  
জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইরাছি ।  
ঈশ্বর স্মরণীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে  
প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম  
ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন । সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত  
হয়, সে বন্দ পাইব ।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমান্দাদি দাস্ত্রভাবে, শ্রীদামাদি সখা-  
ভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবে, এবং গোপীগণ কান্তভাবে  
সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইরাছিলেন । কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার  
সকল আমাদের হইতে এতদূর সংস্থিত, যে তদালোচনায়  
আমাদের বাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না ।  
যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে  
পাইতাম, তবেই সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত ।  
বাক্যলার দুইজন সাধক, আমাদের বড় নিকট । দুইজনই  
বৈদ্য, দুইজনই কবি । এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, বা কালুভাবে দেখেন নাই । রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে । রামপ্রসাদের মাতৃ-প্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প ।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার ।

আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোনার ॥

পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি ।

জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥

তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয় ।

তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয় ?

পুনশ্চ—আর ও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না সুরে বচন ।

কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥

আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় ।

ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, মায় দিও তায় ॥

যার এই ঈশ্বরভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গত্বকার বাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে ? হয় হউক । আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না ।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাসী বা অভোক্তা ছিলেন না । পাঁটা, তপসে মাছ, বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে,

## ৭০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

উভয়েই সক্ষম ছিলেন । যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন । তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ;—

লক্ষীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে ।  
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষী নিয়ে ॥  
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে ।  
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥  
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে ।  
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কুপণের ঘরে ॥

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না ।  
গীতার ভগবদুক্তি এই—

আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ

স্নিগ্ধারস্যাস্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ।

স্বলকথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু । মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্মের শত্রু । লোভী পরদেষী অথচ হবিষ্যাসী ভণ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই । ভণ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না । তিনি জানিতেন ধর্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে । যে ধর্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু । সেই ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ-বশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে, এবং তপ-

সের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত । মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়াহস্ত । ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছি । বিলাসিতা কেন দেখি বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম ।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথা, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথা, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথা আসিয়া পড়িয়াছিলাম । এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে ।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাভঙ্গপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ । শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায় । অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না । যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্ৰ । সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ী । ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ী । দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল । দাশরথি রায়ের কবিত্ব না

## ৭২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাণ্ডে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে ; পাঁচালিওয়াল ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই । এই অলঙ্কার প্রয়োগে পটুতার ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না । এখানেও মার্জিত কটির অভাব জন্য বড় ছঃখ হয় ।

অনুপ্রাস যমক যে সর্বত্রই ছব্য এমত কথা আমি বলি না । ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্যা শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর । কিছুই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর । রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে । বাঙ্গালাতেও তাই । মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয় । শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, দুই এক বৃন্দ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে । ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজ্ঞান চলে যান লবেজ্ঞান করে ।

ইহার তুগনা নাই । কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ নাই—একবার অনুপ্রাস যমকের কোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না । আর কোনদিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে । এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয় । তিনি শব্দের প্রতিবোগীশূন্য অধিপতি ।

এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাশ  
হইতে উদ্ধৃত করিলাম ;—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা ।

করে, বামা, বাসিন্দবরনী,  
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরনি,  
কাহারো ঘরনী, আসিয়ে ধরনী, করিছে দমুজ জয় ।  
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,  
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ নয় ॥  
বামা, হাসিছে ভাবিছে, লাজ না বাসিছে,  
ছলকারবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয় । ১  
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,  
সঘনে বলিছে, গগণে চলিছে,  
কোপেতে জ্বলিছে, দমুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥ ২  
করে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,  
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,  
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা নয় । ৩

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা ।

করে বামা, ষোড়শী রূপসী  
সুরেশী, এ, যে, নহে মাহুসী,  
ভালে শিশুশনী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস ।

দেখ, বাজিছে কম্প, দিতেছে কম্প,

মারিছে লক্ষ, হতেছে কম্প,

গেলরে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি, চরণে কৃতিবাস ॥ ১

করে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,

কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,

ক্রপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস । ২

করে, যোগিনী সঙ্গে, কধির-রঙ্গে,

রণতরণে, নাচে ত্রিভঙ্গে,

কুটলাগঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ । ৩

আহা, যে দেখি পর্ক, যে ছিল গর্ক,

হইল খর্ক, গেলরে সর্ক,

চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ক, করিছে সর্কনাশ । ৪

দেখি, নিকট মরণ, কররে স্বরণ,

মরণহরণ, অভয় চরণ

নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ । ৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল । যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালার, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই । তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন

বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই । পাণ্ডিত্যের অভিমানে নাই—বিগুঞ্জির বড়াই নাই । ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে । এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই । কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই । ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন । তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই ।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাঁহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার এই গুণ । খাঁটি বাঙ্গালা আমাদের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি পাঠকেরও লাগিবে । এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না । হইতেছে ও হইবে । কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয় । বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটার মধ্য পড়িয়াছে । ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা কুত্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি । একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত “খুঁটছান্ন প্রোক্ত্বিবাক্ মলিন্চু” গুণ ধরিয়া সেকলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিগে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছাড়খার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যকর্ষণ, যবকার জ্ঞান, ইবোলিউশন,

ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, কুদে লঙ্কের জাহাজ দেশ উৎপীড়িত ; মাঝে স্বচ্ছ সলিলা পুণ্যতোয়া কুশাগ্নী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর-গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর একগুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরনীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। “বর্ষাকালের নদী”, “প্রভাতের পদ্য” প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্বল্প কথা তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বরগুপ্ত আশ্রম সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম



অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা বাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিগুহ। নিম্ন কর ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুগ্ধ করিবেন,—

ভ্রাতৃত্ব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,

প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথার যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও

চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন । ২৮৪ পৃষ্ঠার মাতৃভাষা শব্দকে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি । “মাতৃ সম মাতৃ ভাষা,” সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে ? “বাল্যলা বুঝিতে পারি,” এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত । আজিও না কি কলিকাতার এমন অনেক কৃতবিদ্যা নরাধম আছে, যাহারা মাতৃ ভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাভূত ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায় । এখন এই মহাত্মার সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে ।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম । ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন । তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের জ্ঞান উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না । এখন যাহা বিগত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিগত, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই ধর্ম্মের বথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্ত, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাথর্য্য হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, - তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা

বিশেষ জানা যায় । এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন । আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন । ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন । এ জগৎ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন ।

তৃতীয় । ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল । তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম ।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব । ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই । গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন । এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ । যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অসুযোগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে । এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র । বাছিয়া বাছিয়া সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে । যদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অস্বাভাবিক খণ্ডে কি থাকিবে ?

নির্বাচন কালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব । এজন্য, কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগুলি না

## ৮০: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ।

ভুলিয়া, সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি । অর্থাৎ কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি । কেবল যাহা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ দিই নাই । আর “ হিতপ্রভাকর, ” “ বোধেন্দুবিকাশ, ” “ প্রবোধপ্রভাকর ” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই । কেননা সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে । তদ্বিন্ন তাঁহার পদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই । ভয়সা করি, তাহার স্মৃত্তক একখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে ।

পরিশেষে বক্তব্য, যে অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাক্ষন কার্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই । তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জনা করিবেন ।

সমাপ্ত ।

# কবিতাসংগ্ৰহ ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত

কবিতাবলী ।



প্রথম খণ্ড ।

নৈতিক এবং পরমাধিক ।



সব হ্যায় ফাক ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হ্যায় ফাক্ ।  
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক ॥

পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর

মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে থাক্ ।

আমি আমি অহকার, আমার এ পরিবার,

কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্ ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ,                      মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,  
চারি দিকে হবে শুদ্ধ,                      রোদনের হাঁক্ ।  
মুদিলে যুগল আঁখি,                      সকল হইবে ফাঁকি,  
কোথায় রহিবে চাকি,                      ভেসে যাবে চাক্ ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ ॥

মিথ্যা স্মৃতি সदा রত,                      শত শত অমুগত,  
গৌরব করিয়া কত, গৌপে দেও পাক্ ।  
পোসাকের দাম মোটা,                      জুতা পায়ে এড়িওটা,  
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা,                      শোভা করে নাক্ ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ ॥

নারীর কোমল গাত্র,                      মদনের সুরাপাত্র,  
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্ ।  
বসনে বিচিত্র সাজ,                      কাবার রঞ্জিল কাজ,  
শিরে দিগে বাঁকা তাজ,                      ঢেকে রাখ টাক্ ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ ॥

স্নেহ করে পরিজন                      সদাই সন্তুষ্ট মন,  
স্বদে স্বদে বাড়ে ধন,                      কত লাক্ লাক্ ।  
রাখিয়াছে বাপদাদা,                      ধপ্ ধপ্ বর্গ শাদা,  
সারি সারি তোড়া বাঁধা,                      শোভে থাকে থাক ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

৩

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ ॥

ছইয়া আশার বশ,                      ভ্রমে চাহ মিছা যশ,  
বিষয় বিষের রস,                      নহে পরিপাক্ ।  
তুমি কেবা, কেবা পুত্র,                      আপনার নাহি কুত্র,  
মিছামিছি মায়াসূত্র,                      শেষ কুন্তীপাক্ ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ ॥

চিন্তা কর পরকাল,                      নিকট বিকট কাল  
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল,                      শমনের ঢাক্ ।  
জীবন ছাড়িবে কোল,                      না রহিবে কোন বোল,  
হরেকৃষ্ণ হরিবোল,                      এই মাত্র ডাক্ ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ ॥

---

## সব ভরপুর ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর,                      বাবা সব ভরপুর ।  
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর,                      বাবা গৌরব প্রচুর ॥  
পেয়েছ উত্তম দেহ,                      যোগ-পথে মন দেহ,  
পরিহরি মোহ মেহ,                      চল সুরপুর ।  
যোগযুক্ত অহঙ্কার,                      করি তাম অলঙ্কার.

## কবিতাসংগ্রহ ।

করহ ওঁকার সার গর্জ হবে চূর ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥

নিখাস হইলে রোধ,

পরিজন হীন বোধ,

কাঁদিলে জনম শোধ,

আহা উছ সুর ।

মুদিলে নয়ন পদ্ম,

মন মধুকর সদ্য,

কৈবল্য কমল সঙ্গ,

পাইবে মধুর ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥

সুখ কভু মিথ্যা নয়,

যত অনুগতচয়.

শীলভায় বশ হয়,

কোন হে চতুর ।

বিধাতার স্ননির্মাণ,

সুখদ সন্তোগ ভাগ,

ভোগ যোগে রাখ মান,

দুঃখ হবে দূর ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥

সুরা কভু নহে হেয়,

সুরজন-উপাদেয়,

রমণীতে সেই পের,

পান কর শূর ।

তাহে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হয়,

প্রজ্ঞাপতি-প্রণা রয়,

পিতৃ নাম নহে কয়,

বৃদ্ধি হয় ভূর ।

• ছনিয়ার মাঝে বাবা, সব ভরপুর ॥

পরিজন-স্নেহনিধি,

যতনে মিলায় বিধি,



এত নহে মন্দ বিধি,                    স্মৃথের অঙ্কুর ।  
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ,                    সৌভাগ্যের স্মৃপ্রভাব,  
মনোগত এই ভাব,                    আদেশ মনুর ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥

আশাই অতুল্য ভোগ,                    কৰ্ম হয় যশোযোগ,  
এত নহে পাপরোগ,                    আরাধ্য সাধুর ।  
স্মৃথের এ কৰ্মভূমি,                    পুত্র মিত্র নহে উমি,  
এ সব তেজিয়া তুমি,                    হইবে কতুর ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥

কুস্তধারী নট মত,                    হর কাল অবিরত,  
গৃহ কার্ণে পুঁকি রত,                    ধিয়াও ঠাকুর ।  
চরম সময় তব,                    শ্রুত মাত্র হরি রব,  
পার হয়ে ভবাৰ্ণব,                    যাবে শাস্তিপূর ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥

## কিছু কিছু নয় ।

ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়, বাবা কিছু কিছু নয় ।  
অয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়,                    বাবা অন্ধকারময় ॥  
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,

## কবিতাসংগ্রহ ।

পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয় ।  
 কারে আমি বলি আমি, আমি যে মরণগামী,  
 মিছামিছি দিই আমি, আমি পরিচয় ।  
 ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত,  
 না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয় ।  
 কার বস্তু কেবা করে, কার বস্তু কার করে,  
 কেবা করে দান করে, কেবা দান লয় ।  
 ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে মাত্র কৰ্মভোগ,  
 তবু পাপ আশা রোগ, সাম্য নাহি হয় ।  
 জলে নাহি তেল মিশে, তথ্যচ না ভাঙ্গে দিশে,  
 বিষম বিষয় বিবে, কিসে সুখোদয় ।  
 ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

কি হেতু সংসার-সূত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র,  
 কোথা ছিলে, যাবে কুত্র, বল মহাশয় ।  
 না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল,  
 বুধা সুখে হয় কাল, নাহি কাল-ভয় ।  
 ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

৭

কারিগুরি বহুতর,                      দৃশ্য বটে মনোহর,  
কলে বন্ধ কলেবর, দেহ যারে কয় ।  
সে কল বিকল হবে,                      তুমি নাহি তুমি রবে  
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয় ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

রমণী-বচন মদ,                      পান মাঝে গদগদ,  
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ, প্রফুল্লহৃদয় ।  
অবশেষ বোধশূন্য,                      স্বভাবে স্বভাষ কৃষ্ণ,  
কোথা তার থাকে পুণ্য, পাপে হয় লয় ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

কারে বল হুচতুর,                      তুমি বটে বাহাদুর,  
যত দেখ ভরপুর,                      ভরপুর নয় ।  
সুখ লাভ করিবার,                      বস্তু নয় পরিবার,  
হুখে কাল হরিবার, হেতু সমুদয় ।  
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥

হিসাবের পথ সোজা,                      ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,  
সহজেই যার বোঝা, তার বোঝা নয় ।  
ভব-ভ্রম পরিহারি,                      মুখে বল হরি হরি,  
কৃতান্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময় ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

ছনিয়ার মাঝে বাণা কিছু কিছু নয় ।

ময়ন মুদিলে সব অন্ধকারময় ॥

## ঈশ্বরের করুণা ।

অখিল সংসার,                      রচনা যাহার,

সেজন কি গুণ ধরে ।

নিয়মে সৃজন,                      নিয়মে পালন,

নিয়মে নিধন করে ॥

এ ভব বিষয়,                      সব শিবময়,

শিবের সাগর ভব ।

শুন ওহে জীব,                      ভোগ কর শিব,

অশিব কি আছে তব ॥

অনাদি কারণ,                      সূত্রে কারণ,

বিধান করেন কত ।

নীতিমত যোগে,                      রহ সূখ ভোগে,

মনের বাসনা যত ॥

কুরীতি কলাপ,                      কুসহ আলাপ,

বিষম বিলাপ হর ।

করি অবধান,                      হোয়ে সাবধান

বিধান পালন কর ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

২

ভোগের কারণ,           যাহা চায় মন,

'সকলি রোয়েছে কাছে ।

ধরিয়া স্বভাব,           বিরাজে স্বভাব,

কিসের অভাব আছে ?

যে নিধি চাহিবে,           তাহাই পাইবে,

ভবের ভাণ্ডার ভরা ।

নানা ফুল ফল,           সুশীতল জল,

ধারণ করেছে ধরা ॥

আহার বিহার.           অশেষ প্রকার,

সকলি বিধির বিধি ।

অবিধি হরিয়া,           সুবিধি ধরিয়া,

পাইবে পরম নিধি ॥

রাখ সেই ক্রম,           যেরূপ নিয়ম,

অনিয়ম হোলে পরে ।

শরীর রতন,           অকালে পতন,

যতন কেহ না করে ॥

হইলে অতীত.           তখনি পতিত,

কণিত নিগূঢ় কথা ।

নিয়ম যে রাখে.           সাধু বলি শুকে,

সুখী যেই যথা তথা ॥

অভিমত মত,           কায়ে হোয়ে রত,

অবিরত চাক্স দেহ ।



যদি কোন ক্রমে,      আপনার ভ্রমে,  
অস্থখ-মাগরে পশি ।

ওরে মূঢ়মতি,      জগতের পতি,  
তাহে কভু নন দোষী ॥

এই ধরাতলে,      নিজ কৰ্ম ফলে,  
সকলে করিছে ভোগ ।

স্বকৰ্ম ভুলিয়া,      ঈশ্বরে ছুসিয়া,  
মিছা করে অভিযোগ ॥

আঁধিহীন নর,      প্রভাকর-কর,  
দেখিতে কভু না পায় ।

নিজ তাপ ভরে,      তাপ সোয়ে মরে,  
অথচ অশ গায় ॥

রূপের আড়ালে,      তিমির বিনাশে,  
ভুবন প্রকাশে যেই ।

সেই প্রভাকরে,      দোষারোপ করে,  
মনে বড় খেদ এই ॥

এসে এই ভবে,      জ্ঞানহীন সবে,  
ব্রহ্মপথে সদা ভ্রমে ।

ছুখ পায় যত,      ঘেয় করে তত,  
নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥

হায় হায় হায়,      একি ঘোর দায়,  
একথা বুঝাব কারে ।





কত বলে বলী,                    কত ছলে ছলি,

কত ছলে আনি চাকি ।

যথায় তথায়,                    কথায় কথায়,

কত জনে দিই ফাঁকি ।

দেখ এ নগরে.                    প্রতি ঘরে ঘরে,

আমারে কেবা না জানে ?

আমা সম নাই,                    জরী সব ঠাই,

আমারে কেবা না মানে ?

সকলেই বস,                    ভবভরা বশ,

দশ দিকে আছে গাঁথা ।

হকুমে হাজির,                    উজির নাজির,

বাদসার কাটি মাথা ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,                    কুল-পুরোহিত,

আর যত দ্বিজ আছে ।

ড্যাম্ ড্যাম্ সব,                    মুখে নাই সব,

ভয়েতে আগে না কাছে ॥

“হট” বোলে উঠি,                    “বুট” পারে ছুটি,

কেমন আমার ভাব ।

কত আমি গুরু,                    ওই দেখ গুরু,

দিতেছে গোরুর জাব ॥

নিজ বল বল,                    নিজ দল দল,

আপনা আপনি স্থানি ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

কোথায় জঁখর,                      নহে সুখকর,

তাঁরে আমি নাহি মানি ॥

সুখের সময়,                      সুখের উদয়,

আমা হোতে হয় সব ।

নিজে আমি বড়,                      সব দিগে দড়,

কিসে হব পরাভব ?

টলে যদি রতি,                      মদনের রতি,

আনি এইখানে বোসে ।

আমার প্রতাপে,                      ত্রিভুবন কাঁপে,

রবি শশী পড়ে খোসে ॥

কোথা সুররাজ,                      কোথা তার বাজ

গোঁপে যদি দিই চাড়া ।

সহিত অমর,                      করি যোড়কর,

এখনি হইবে খাড়া ॥

অসাধ্য আমার,                      কিছু নাহি আর,

সকলি করিতে পারি ।

থেকে এই পুরে,                      খাই সাধপুরে,

ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥

দেবতার স্থল,                      দিই রসাতল,

ধরা জ্ঞান করি সরা ।

দেখ দিয়া কর,                      আমার উদর,

চারি পোয়া শুণে ভরা ॥

গুণ আছে যাই,            প্রকাশিয়া তাই,  
হয়েছি প্রধান ধনী ।

সকলেই কর,            সব দিকে জয়,  
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥

এই দেখ নাম,            এই দেখ থান,  
এই দেখ বালাখানা ।

এই দেখ পাখা,            মখমলে ঢাকা,  
কারিগুরি তার নানা ॥

এই দেখ বাড়ী,            এই বাড়াবাড়ি,  
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া ।

এই দেখ তাজ,            এই দেখ সাজ,  
এই দেখ জামাজোড়া ॥

এই দেখ ছাতি,            এই দেখ হাতী,  
এই দেখ সপমোড়া ।

এই দেখ তেজ,            এই দেখ সেজ,  
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥

কেমন পুকুর,            কেমন কুকুর,  
কেমন হাতের কোড়া ।

কেমন এ ঘড়ি,            কেমন এ ছড়ি,  
কেমন ফুলের তোড়া ॥

দেখনা কেমন,            চিকন বসন,  
জাহাজে এসেছে সবে ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

রাজা আমি যাই,      তাই সিন্ পাই,  
                                  আর কি এমন হবে ?  
 কেমন বিছানা,      এ কথা মিছা না,  
                                  এসেছে বিলাত থেকে ।  
 দোষেনি জনেকে,      মোহিত অনেকে,  
                                  আমার এ ঝাড় দেখে ॥  
 আঁখি যদি পাড়ে,      আমার এ ঝাড়ে,  
                                  দোষ দিতে পারে কেটা ?  
 কবি কহে ভালো,      ঝাড়ে নাই আলো,  
                                  ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥  
 নাহি জেনে সার,      একরূপ প্রকার,  
                                  কত অহঙ্কার করে ।  
 নাহি পায় হিত,      হিতে বিপরীত,  
                                  পাপানলে পুড়ে মরে ॥  
 শুমরে পামর,      বোধহীন নর,  
                                  সকলি ভোজের বাজী ।  
 মিছে তোর ধন,      মিছে তোর জন,  
                                  মন যদি হয় পাজী ॥  
 মিছে বাড়াবাড়ি,      মিছে তোর বাড়ী,  
                                  মিছে তোর গাড়ি ঘোড়া ।  
 কোরোনা অমন,      হইবে দমন,  
                                  শমন মারিকে কোড়া ॥





একি পাপ রোগ, হোলে ছুখ ভোগ,

অনুযোগ করে কত ।

বলে “ হায় হায় ,, ঈশ্বর আমায়,

সারিলে জনম মত ।

না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে,

উঠানের দেয় দোষ ।

অস্ত্রে কাটি হাত, করি রক্তপাত,

কামারের প্রতি রোষ ॥

অবোধ যে জন, বিষম ভীষণ,

তাহার চরণে গড় ।

অধিক খাইয়া, উদর ফাঁপিয়া,

জননীয়ে মারে চড় ।

না জানে সঁতার, না পায় পাথার,

হাঁফ লেগে প্রাণে মরে ।

না করি বিচার, সরোবর যার,

তারে তিরস্কার করে ।

শুন হে চেতন, হও হে চেতন,

অচেতন কত রবে ?

জয় দাতারাম, পরমেশ নাম,

আর কবে ভাই কবে ?

পিতা মাতা ভব, দেখালেন ভব,

করহ তাঁদের সেবা ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

বাপ মার পর,                      আছে এক পর,

হিতকর আর কেবা ?

আর আর কত,                      পরিবার বত,

বিচরে ভারতভূমি ।

যে জন যেমন,                      তাহারে তেমন,

ব্যবহার কর তুমি ॥

সাধ্য যে প্রকার,                      পর উপকার,

বত পার তত কর ।

অপরাধী জনে,                      ক্ষমা করি মনে,

তার অপরাধ হর ॥

পেয়েছ শ্রবণ,                      কর রে শ্রবণ,

পীযুষ-পূরিত কথা ।

পেয়েছ চরণ,                      কর রে চরণ,

সাধুজন আছে যথা ॥

পেয়েছ নয়ন,                      কর দর্শন,

ভবের ব্যাপার সব ।

পেয়েছ রসনা,                      পূরাও বাগনা,

কর হরি হরি রব ॥

পেয়েছ যে নাশা,                      সুবাসের বাসা,

করহ তাহার হিত ।

পেয়েছ যে কর,                      বিরচন কর,

পন্ন প্রভুর গীত ॥





লইতেছ পর ধন, বিস্তারিয়া কর ।  
 মরণ নিকট অতি, স্মরণ না কর ॥  
 আগে জান অহং কার, অহঙ্কার পরে ।  
 পরে পরে পর জ্ঞান, না চলিলে পরে ॥



## মায়ী ।

বিষ্ণুরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর ।  
 শোভিত সূচারু আলো, সূর্য্য শশধর ॥  
 স্বভাব স্বভাবে লোরে, সম্পাদন ভার ।  
 করিছে সকল সূত্র, হোয়ে সূত্রধার ॥  
 জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত ।  
 সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥  
 ছয় কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ ।  
 রঙ্গভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ ॥  
 অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক ।  
 আমরা সকলে তাঁর, বাত্রার বালক ॥  
 প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লোরে ।  
 বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে ॥  
 শিল্পকালে একরূপ, সহজে সরল  
 অখল অপূর্ব ভাব, অবল অচল ॥

স্নকোমল কলেবর, অতি সুললিত ।  
 নব নবনীত সম, লাষণ্য গলিত ॥  
 ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয় ।  
 নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥  
 আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ ।  
 যুবক সূর্যোর সম, দীপ্ত হয় রূপ ॥  
 দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল ।  
 নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥  
 ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ ।  
 বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥  
 পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন ।  
 কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ ॥  
 আছে চক্ষু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায় ।  
 আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায় ॥  
 আছে কর, কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার ।  
 আছে পদ, কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার ॥  
 পলিত কুস্তলজাল, গলিত দশন ।  
 ললিত গাত্রের মাংস, স্থলিত বচন ॥  
 ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল ।  
 এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥  
 ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ ।  
 তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥

কেবল কুহকে ভুলে, কোঁতুক দেখাও ।  
 আপনি কোঁতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥  
 ভাল কোরে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায় ।  
 কর তাই অধিকারী, ছুঁই হন যায় ॥  
 যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে ।  
 এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গা যাত্রা হোলে ॥

স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল ।  
 ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিত্র জাল ॥  
 ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর ।  
 ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥  
 হায় একি অপক্লপ, ঈশ্বরের খেলা ।  
 এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা ॥  
 ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব ।  
 দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব ॥  
 ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ ।  
 দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ ॥  
 কবে ভূত ছিল ভূত, আবিভূত কবে ।  
 পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হবে ॥  
 ভূতের বাসার থাকো, দেখোনাকো চেয়ে ।  
 দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে ॥  
 ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার ।

অথচ জাননা কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥  
 কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দরা ।  
 নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥  
 এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন ।  
 এই ভূত করিয়াছে, গয়ার সৃজন ॥  
 এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত ।  
 হলিঘোটে ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত ॥  
 ভূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার ।  
 সর্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব ধার ॥  
 ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন ।  
 অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন ॥

আসিয়াছ জগতের মেলা দরশনে ।  
 দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥  
 কিন্তু এক উপদেশ কর, অবধান ।  
 ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান ॥  
 দেখো যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল ।  
 কোরোনা কাচের সহ, কনকের তুল ॥  
 তাঁরে দেখ একবার, ধার এই মেলা ।  
 মেলার আমোদে মেতে, দেখোনাক মেলা ॥



গরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রেমুতা-সুতা,  
সিংহ-প্রাণ করিল হরণ ।

একজন দক্ষ্য আসি, মারিয়া তুলার রাশি,  
বধিবেক কন্যার জীবন ॥

তার দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,  
বিছা যাবে ধনুকের হাতে ।

ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,  
মকর মরিবে কুস্তাঘাতে ॥

কুস্ত জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন,  
এই দিন হবে পুনর্কার ।

স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা,  
এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥

প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্য যত,  
এই ভাব এইরূপ সব ॥

এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই ভূমি,  
রব কিম্বা রবে এক রব ॥

তাই বলি অদ্য নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা,  
অস্থির হয়েছে মম মন ।

এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,  
আর কি পাইব দরশন ?

বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, ভূমি নাহি আর রবে,  
ঘুবি সহ এলে পরে অহ ।

অতএব বলি তাই,                    এই এক ভিক্ষা চাই,  
স্থির ভাবে রহ রহ রহ ॥

## শরীর অনিত্য ।

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ।  
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥  
পাতিয়া বিষম জাল,                    বৃথা সুখে হর কাল,  
শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয় ।  
অনিত্য দেহের আশা,                    কেবল ভূতের বাসা।  
যে আশায় ভবে আশা, তাহে হও নয় ।  
জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥  
দেহ গেহ নবদ্বার,                    তিন স্থান শূন্য তার,  
যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয় ।  
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্শ্ব,                    নীতিমত কর কর্শ্ব,  
পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার ভয় ।  
জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ।  
আমি আমি অহঙ্কার,                    ফলিতার্থ আমি কার,  
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয় ।  
মুদিলে যুগল আঁখি,                    সকল তইবে ফাঁকি,  
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয় ।



জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,

দৃশ্য বটে মনোহর, পঞ্চভূতময় ।

যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,

সুখদল হতবল, দুঃখের উদয় ।

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,

বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয় ।

ভ্রম-নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধর,

রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয় ।

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,

এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয় ।

বদবধি থাকে কায়া, জ্ঞান-নেত্রে দেখ মায়া,

তাস্থিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয় ।

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

আমি মুখে আমি কই ফলিতার্থ আমি কই,

আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয় ।

দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,

মোহযুক্ত এ সংসার, কঙ্কিকারময় ।

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

ষেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,

## কবিতাসংগ্রহ ।

সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয় ।

রসনারে কর বশ,                      বিভূষণায়ত রস,

পান করি লভো বশ, হবে কাল জয় ॥

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ।

দয়া ধর্ম উপকার,                      কর নিজ অলঙ্কার,

গলে পর চাকুহার, বিশেষ বিনয় ।

মিছা ধন উপার্জন,                      ভবে ভাব নিত্যধন,

স্বরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয় ।

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

এক ভিন্ন নাহি আর,                      তিনি সংসারের সার.

আত্মরূপে সবারকার, হৃদয়ে উদয় ।

অনিত্য বিষয় বিত্ত,                      নিত্যরূপে ভাব নিতা,

ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময় ।

জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

## রোজসই ।

অহরহ, অহরহ, কত গত হয় ।

এই অহ, এই রহ, লোকে এই কর ॥

রাত্রি দিন যুক্ত, কাল সমুদয় ।

দিন রাত্রি আছি আমি, মুখে পরিচয়

দেখি বটে এই কাল, কলত অদৃষ্ট ।  
 সুখ দুখ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট ॥  
 প্রপঞ্চ শরীর পেয়ে, যত দিন রই ।  
 এই কাল এই আমি এই মাত্র কই ॥  
 নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই ।  
 কভু ভাবি, আমি আমি, কভু আমি নই ॥  
 বই করি স্থিতিকাল, খুলে দেহ বই ।  
 ভবের খাতায় শুধু, করি ঢেরা সই ॥  
 বাজিল ছুটার ঘড়ি, হলো রোজসই ।  
 আর কেন ওহে ভাই. কর হই হই ?  
 বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই ।  
 কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই ॥  
 আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই ।  
 দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই ॥  
 কুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই ।  
 ডুবিলে মায়ার হৃদে, পাবেনাকো থই ॥

## তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন যুক্তি নাই ।

সাংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগ ।  
 মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ ॥  
 সুখের বাসনা যত, করি পরিহার ।  
 নিরাহারে কভু থাকে, কভু নীরাহার ॥

ইচ্ছাধীন আহাৰ না, চাহ কারো ঠাঁঠি ।  
 এরূপ সাধনা করি, কোন কল নাই ॥  
 জলদের মুখ চেয়ে, গগণেতে থাকে ।  
 শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে ॥  
 প্রাণাস্ত মহীর নীর, কভু নাহি লয় ।  
 চাতক চাতকী তবে, যোগী কেন নয় ?

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়, কামনাবিহীন ।  
 লোকের সমাজে তুমি, সাজিয়াছ দীন ॥  
 ত্যজিয়াছ বসন, ভূষণ চারু বেশ ।  
 উলঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে, ভ্রম দেশ দেশ ॥  
 পরিচ্ছদ পরিহারে, প্রাজ্ঞ হলে পর ।  
 উদ্ধার হইত কত, খেচর ভূচর ॥  
 স্বেচ্ছাধীন চিরদিন, বথা তথা ভ্রমে ।  
 মুখ ভোগ আতিশয়া, নাহি কোন ক্রমে ॥  
 লজ্জাহীন দিগম্বর, নিজ ভাবে রয় ।  
 বনের গর্দভ তবে, যোগী কেন নয় ?

স্বেচ্ছাচারী হয়ে তুমি, স্বেচ্ছাচার ধর ।  
 খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহি, বিবেচনা কর ॥  
 স্নান চত. স্নখে রত, শ্রমত প্রচার ।  
 কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার ॥

বাহা ইচ্ছা সূখে তাহা, করিছ ভক্ষণ ।  
 ভক্ষণ কখন নয়, যোগের লক্ষণ ॥  
 আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘুরিয়া ।  
 বাহা পায়, তাহা খায়, উদর পূরিয়া ॥  
 ভক্ষ্যাভক্ষা বিচারেতে, ঘণা নাহি হয় ।  
 শূকর শূকরী তবে, যোগী কেন নয় ?

শরীরের সমুদয়, লোমকূপ ঢেকে ।  
 দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভস্ম মেখে ॥  
 বড় ছটা ঘোব ষটা, ভজনার জাঁক ।  
 নাখে মাঝে টুচ্চ রবে, ছাড়িতেছ ডাঁক ॥  
 ভ্রম হেতু যোগতত্ত্বে, হারিয়েছ দিশে ।  
 ডেকে ডেকে ছাই মেখে, যোগী হবে কিসে ?  
 ভস্মমাখা কলেবর দৃশ্য ভয়ঙ্কর ।  
 ভয়ে কাঁপে থর থর দেখে যত নর ॥  
 থেকে থেকে ডাঁক ছাড়ে, ভস্ম মাঝে রয় ।  
 কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয় ?

শীত গ্রীষ্ম সহ্য কর, নিজ দেহ বলে ।  
 দুখ বোধ নাহি মাত্র, রৌদ্র আর জলে ॥  
 জল আর তৃণফল, করিয়া আহার ।  
 উপস্যায় চিরকাল, করিছ বিহার ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

সম্ভাটের সহ্য কর, সকল সময় ।  
 উপস্থীর এই যদি, সত্যধর্ম হয় ।  
 ভূগ জল খায় শুধু, কাননে বসতি ।  
 হিংসামাত্র নাহি করে, সদা শুদ্ধমতি ॥  
 শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র জল, সহ্য সমুদয় ।  
 বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয় ?

শিবদুর্গা তারা রাম, বলিতেছ মুখে ।  
 সদা কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ মুখে ॥  
 দেবদেবী নাম সব, মনে পড়ে যত ।  
 উচ্চঃস্বরে উচ্চারণ, কর তুমি তত ॥  
 লোক মাঝে জানী হও, স্তব পাঠ করি ।  
 দেবদেবী নাম নহে, ভবসিদ্ধ-তরী ॥  
 কৃষ্ণ রাম মুখে বলি, মুক্ত হলে পর ।  
 মুক্তিপদ প্রাপ্ত হতো, বিহঙ্গ খেচর ॥  
 রাধাকৃষ্ণ শিবদুর্গা, সদা মুখে কর ।  
 গুণ আর শারী তবে, যোগী কেন নয় ?

মঠধারী হও তুমি, লইয়াছ ভেক ।  
 চুটী ভাই প্রভুপ্রেম, মুখে অতিবেক ॥  
 সঙ্গতের সঙ্গ গুণে, পঙ্গতে বসিয়া ।  
 অধর-অমৃত খাও, রসিয়া রসিয়া ॥

পত্রে পত্রে এক করি, প্রভুপ্রেম যাচ ।  
 উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাচ ॥  
 আহার দেখিলে পরে, সন্তোষিত থাকে ।  
 লাজুল বিস্তার করি, মেও মেও ডাকে ॥  
 পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, মনে তুষ্ট রয় ।  
 গৃহীর বিড়াল তবে, যোগী কেন নয় ?

রঙ্গ দিয়া অঙ্গরাগ, অঙ্গ সুশোভিত ।  
 দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত ॥  
 শিষ্টবেশ হতকেশ, অপরূপ ভাব ।  
 সমুদয় শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব ॥  
 নাসিকায় চিত্র করা, তাহে রসকলি ।  
 গলায় ত্রিকণ্ঠি বান্ধা, গায়ে নাম্রাবলী ॥  
 ছাব মেরে ভাব জারি, তাহে কিবা ফল ।  
 তিলক কুতলি নহে, মুক্তির সম্বল ॥  
 বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয় ।  
 ময়ূর ময়ূরী তবে, যোগী কেন নয় ?

পূজা, হোম, যজ্ঞ, যাগ নানারূপ ক্রিয়া ।  
 গঙ্গাতীরে ধুমধাম, কোষাকুশি নিয়া ॥  
 ফুল তুলি স্নান করি, পূজার নিবেশ ।  
 মাল্যের মালঞ্চ সব, করিয়াই শেষ ॥

পিতলের গোপালের, পরম আদর ।  
 নিশ্চয় করছ শিব, কাটিয়া পাথর ॥  
 লইয়া পিস্তল খণ্ড, মাথাও চন্দন ।  
 মনে মনে ভাব তায়, নন্দের নন্দন ॥  
 কাটিয়া প্রস্তর কাঁসা, যোগী যদি হয় ।  
 কাঁসারি ভাস্কর তবে, যোগী কেন নয় ?

সুখ ছুখ কিছু মাত্র, রোধ নাই মনে ।  
 সমভাবে একা ভূমি, বাস কর বনে ॥  
 দিবানিশি ধরাসনে, মুদিয়া নয়ন ।  
 কণ্টক ভূগের পৃষ্ঠে, সুখেতে শয়ন ॥  
 গোপনে নিবিড় স্থানে, আছ মাত্র একা ।  
 মানুষের সঙ্গে আর, নাহি হয় দেখা ॥  
 একুপ বিরল ভাবে, বাস করি বনে ।  
 সিক হয়ে বিভূ পায়, ভ্রম মাত্র মনে ॥  
 নিয়ত নির্জন হয়ে, বনবাসে রয় ।  
 ভল্লুক শাদ্দুল তবে, যোগী কেন নয় ?

শরীরে বিশেষ চিহ্ন, করিয়া প্রকাশ ।  
 বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্মের আভাস ॥  
 বাধ্য করি নিজ মতে, বন্ধ করি দল ।  
 বিস্তার করিছ ক্রমে, যত যুক্তি বল ॥



ধর্মের সূচনা করি, নাম হলো জারি ।  
নানারূপ গীত বাদ্য, আড়ম্বর ভারি ॥  
সাধনায় সাধুভাব, স্বভাবে সরল ।  
ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল ॥  
টোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞানী যদি হয় ।  
নটী নট, যাত্রাকর, যোগী কেন নয় ?

---

## পরমার্থ ।

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি ।  
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥  
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে ।  
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে ॥  
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ ।  
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ ॥  
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই ।  
জগদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই ॥

প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে ।  
এখনি শিখুক গিরা, পতঙ্গের কাঁছে ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা ।  
 অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হর সারা ॥  
 লাক মেরে কাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় মুখে ।  
 একবার আঁহা, উহ, করেনাকো মুখে ॥  
 সহজে কি প্রেম কোরে তারে পারি বোকা ।  
 চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোয়ে থোকা ॥  
 জানাশুণে কাঁপ দেরে, দূরে যাক ধোকা ।  
 এখনি পুড়িয়া মর, হোয়ে প্রেম-পোকা ॥

ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হোয়ে ।  
 ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লোরে ॥  
 পেট নিরা, ঘরে ঘরে, যদি গুণ হাপু ।  
 এমন সম্যাসে তোর, ফল কিরে বাপু ?  
 ঘর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয় ।  
 তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয় ॥  
 রোসে থাকো এক ঠাই, নীরব হইয়া ।  
 টেঁচাওনা কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া ॥

কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাঁচিবে ?  
 এ ভাবে ক্লান্তি আর, জীবন যাপিবে ?  
 কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল ?  
 কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল ?

কদিন ইন্দ্রিয়গণ, রবে আর বশ ?  
 কদিনু করিবে ভোগ, বিষয়ের রস ?  
 জীবন জীবনবিষ, স্থায়ী কভু নয় ।  
 নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন কি হয় ॥  
 শত বর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার ।  
 রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার ॥  
 বালা, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল ।  
 বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল ॥  
 তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা ।  
 কলহ, দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা ॥  
 তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকি যাহা রয় ।  
 দলাদলি নির্দ্বন্দ্বিতা, করে তাহা ক্ষয় ॥  
 অহরহ পাপপথে, চালে দেহ রথ ।  
 ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থ-পথ ॥  
 গতকাল পুন কিছু আসিবে না আর ।  
 আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার ?  
 বর্তমান কাল শুধু, হিতকর হয় ।  
 করিতে উচিত যাহা, কর এ সময় ॥

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায় ?  
 জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায় ॥  
 আর কভু বুঝিবে হে, মেলায় মেলায় ?

এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥  
 ভূতে করে হাড় গুঁড়া, ঢেলায় ঢেলায় ।  
 জাননা কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় ?

যুক্তি যুক্তি করি সদা, যত নারী নরে ।  
 কথার বসারে হাট, কেনা বেচা করে ॥  
 কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান ।  
 সকলেই গুনিতেছে, কারো নাহি কাণ ॥  
 সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই ।  
 কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই  
 প্রকৃতি প্রকৃতি পেলো, আকৃতির নাশ ।  
 পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ ॥  
 অবিনাশী আত্মা এক, স্বভাবেই রয় ।  
 বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয় ?

—\*—

## সংগীত ।

রাগিনী ললিত—তাল আড়া ।

কি হবে, কি হবে, তবে, কি হবে আমার হে ।  
 কত দিনে পাব আমি প্রবোধ কুমার হে ?  
 ভূতময় যত হয়,                      কিছু তার সার নয়,

সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে ॥  
 কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,  
 মানসমন্দিরে মম, করহ বিহার হে ।  
 সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ,  
 স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥  
 মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে,  
 নিরন্তর ঢেকে রেখে, নগ্ননের দ্বার হে ॥  
 সকলে তোমায় কর, নিরাকার নিরাময়,  
 আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে ॥  
 কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি যতরূপ,  
 তাবতেই তবরূপ, রোয়েছে প্রচার হে ॥  
 দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,  
 হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে ॥  
 অচল সচলচয়, রূপ শোভা যত হয়,  
 সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে ॥  
 তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,  
 একে একে সমুদয়, হয় অন্ধকার হে ॥  
 কেমন মনের ভুল, জীব সব বুঝে মূল,  
 ভব-মূল, তব মূল, বোধ আছে কার হে ?  
 না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চায়,  
 সঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে ?  
 মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভাব ধরিলাম,

কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে ॥  
 ভয় করি পর-ক্রোধ,                      অনুরোধ উপরোধ,  
 জনমের পরিশোধ, হইল এবার হে ॥  
 আমি দ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি,  
 এ অরুচি, এই রুচি, দেশ-ব্যবহার হে ॥  
 মতে মতে দিয়া মত্ত,                      সময় হইল গত,  
 এখনো রাখিব কত, পাপ দেশাচার হে ॥  
 কেবা বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচি, কেবা শুচি,  
 দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে ॥  
 বৃথা করি পরিশ্রম,                      তোমার রূপার ক্রম,  
 বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে ॥  
 অবিদ্যার ঘোর জোর,                      রজনী না হয় ভোর,  
 কেবল করিছে সোর, চোর অহঙ্কার হে ॥  
 যতদিন শত্রু সবে,                      প্রবল হইয়া রবে,  
 ততদিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে ॥  
 বপুবাসে রিপুদল,                      প্রকাশ করিছে বল,  
 ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তার হে ।  
 থাকিতে সরল সোজা,                      না হইল সার বোঝা,  
 ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে ॥  
 আমার দেখিয়া দীন,                      এখন সুদিন, দিন,  
 তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে ॥  
 গত বৃত্ত হয় ভাবী,                      ততই ভাবেতে ভাবি

সে রূপ ভাবের ভাবী, কবে হব আর হে ॥  
 গুপ্ত কথা নাহি কোয়ে, হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,  
 আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, ভুগি কারাগার হে ॥  
 দিয়েছ ঈশ্বর নাম, না দিলে ঈশ্বর ধাম,  
 ঈশ্বর তোমার নাম করিয়াছি সার হে ॥  
 কি করিব নাম নিয়া, ভুষিলেনা ধাম দিয়া,  
 নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে ॥  
 বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,  
 সকলেই যেন কর, ঈশ্বর তোমার হে ॥



## প্রণাম তোমায় ।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা ।  
 দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥  
 আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব ।  
 হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব ॥  
 তরুণ তপন করে, তরল তামস ।  
 লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥  
 ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবাসুর ।  
 ধরতর কর কর হন, দিবাকর ॥  
 ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

দিন যত গত, তত, দীন দিনপতি ॥  
 পরিশেষ পুনর্বার, ঘোর অন্ধকার ।  
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥  
 এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।  
 তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?  
 এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।  
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে ।  
 শত শত শতদল, শোভা করে বনে ॥  
 কুমুমের বাস ছেড়ে, কুমুমের বাস ।  
 বায়ু ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস ॥  
 মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ ।  
 আস্যভরা হাস্য তায়, দৃষ্ট অপরূপ ॥  
 মাছে মাছে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে ।  
 রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥  
 শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া ।  
 বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া ॥  
 কণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার ।  
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥  
 এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।  
 তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?



এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।  
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস ।  
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ ॥  
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব ।  
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥  
আর বার দেখি তার, নাহি সেইরূপ ।  
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ ॥  
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি ।  
তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাসি ॥  
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব ।  
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥  
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার ।  
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥  
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।  
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?  
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।  
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব ।  
এই রূপ, এই রস, এই আছে রস ॥

এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সর্ব ।  
 এই এই, আর নেই, পরে এই শব্দ ॥  
 এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার ।  
 এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার ॥  
 এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন ।  
 এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন ॥  
 এই মেধা, এই যত্ন, এই অনুমান ।  
 এই ভূমি, এই আমি, এই অভিমান ।  
 ক্ষণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার ?  
 প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥  
 এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।  
 তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্যকার ॥  
 এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।  
 প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥



## ভক্ত ।

কলেবর কুর্নিবেশে ইন্দ্রিয় তঙ্কর ।  
 ধরিত্যা প্রবল বল, আছে নিরন্তর ॥  
 পরমার্থ পুরুষার্থ, করিছে হরণ ।  
 একবার কেহ নাহি, করে দরশন ॥

কেমন অজ্ঞান হোয়ে, আছে সব জীব ।  
কখনো করে না মনে, আপনার শিব ॥  
নিজ ঘরে চুরি তার, শাসন না হয় ।  
হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয় ॥

নিজ জ্ঞান আছে যার, মানুষ সে হয় ।  
জ্ঞানহীন যত জীব, পশু সমুদয় ॥  
প্রাতে করে মল মূত্র, সবে পরিহার ।  
দিবা ত্রিপ্রহরে করে, সবাই আহার ॥  
নিশিতে \* \* \* পরে নিদ্রাযোগ ।  
পশুতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ ॥  
নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে ।  
পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে ?

আপনার দেহ আর, আপনার দারু ।  
অনায়াসে রক্ষা করে, পশু পক্ষী যার ॥  
সে রুড় বিষম নহে, কঠিন তো নয় ।  
স্বভাবের ধর্ম তাহা, সহজেই হয় ॥  
ক্রিয়াপাশে বন্ধ সব, যে দিকেতে চাই ।  
পরতন্ত্রপরায়ণ, দেখিতে না পাই ॥  
জ্ঞানীরে মানুষ বোধে নমস্কার করি ।  
মাথায় মুকুতা-হার, সেই করী করী ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

ডাকছেতে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত ।  
 নানারূপ বেশ ধরে, দান্তিকের মত ॥  
 কভু হুর্গা, কভু শিব, কভু বলে হরি ।  
 করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি ॥  
 বাক্‌সিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, ছলেতে জানায় ।  
 কাগী, বগী, ভয় করে, কথায় কথায় ॥  
 আপনারে বড় রোলে, মরে অভিমানে ।  
 অথচ সে আপনারে, কভু নাহি জানে ॥

সদাই আসক্ত মন, সংসারের সূখে ।  
 শোক আর তাপ পেয়ে, দন্ধ হয় দুখে ॥  
 সংসারের যত ধর্ম, সকলি সে ধরে ।  
 কিছু নাহি বাকি রাখে, সকলি সে করে ।  
 অথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয় ।  
 আমি হই ব্রহ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয় ॥  
 জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন ।  
 কুর্শ্ব আর ব্রহ্ম তার, উভয় পতন ॥

প্রতিদোষে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে ।  
 দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে ?  
 পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কূপে ।  
 উদ্ভিবাক শক্তি আর, নাহি কোনরূপে ॥

একেতো অধীর অক্ষ, তাহাতে বধির ।  
 কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির ॥  
 করিয়া পরমপথে, কণ্টক প্রদান ।  
 শব্দ নিয়া করে শুধু, অর্থের সন্ধান ॥

বন্ধ করি বাক্যবাহ কাব্য অলঙ্কারে ।  
 পুরাণাদি শাস্ত্র শব্দ, রাখে ধারে ধারে ॥  
 পরস্পর মত্ত সবে, বিচার-সমরে ।  
 কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে ॥  
 বচনের স্তম্ভ তুলে, ব্যাকুল চিন্তায় ।  
 পরম ভারের ভারে, অভাব ঘটায় ॥  
 কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতরের সার ।  
 শাস্ত্রের সত্ত্বাব ভেঙে, একে করে আর ॥

বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে, মর্মে নাহি লয় ।  
 মিছে পোড়ে কি হইবে, নাহি ফলোদয় ॥  
 বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন ।  
 অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ ॥  
 বুদ্ধিমানের শাস্ত্র পড়ে, তব্ব লয় তার ।  
 অবোধে কি পারে তব্ব, তব্ব কোথা তার ?  
 শব্দবোধে শুধু হয়, বিদ্যার প্রকাশ ॥  
 সংসারের মোহ তার, নাহি হয় নাশ ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

কোন নর কোটি বর্ষ, বেঁচে যদি রয় ।  
তথাপিও শাস্ত পোড়ে, শেষ নাহি হয় ॥  
কত গুণ সম্ভাবনা, হয় একাধারে ।  
শাস্তরূপ সিদ্ধপারে, কে বাইতে পারে ?  
কর কর যত পার, শাস্তের আলাপ ।  
কিন্তু তারে মন যেন, না দেখে প্রলাপ ॥  
দেখিবে প্রত্যক্ষ বাহা, মেনে লবে তাই ।  
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই ॥

আয়ুহর বিঘ্নকর, শাস্ত সমুদয় ।  
সমুদয় শাস্ত পোড়ে, জ্ঞান কার হয় ?  
শাস্ত পাঠে নাহি হয়, মালিন্য মোচন ।  
কখনই শাস্তি নয়, মোক্ষের কারণ ॥  
বিদ্যা কিছু অস্তরের আঁধার না হরে ।  
মুক্তি আর জ্ঞানপথে, বিড়ম্বনা করে ॥  
শাস্ত পোড়ে বিদ্যা শিখে, ঘোচে না রক্ষন ।  
মুক্তির কারণ শুধু, একমাত্র মন ॥

য়েছে বেছে মারি লও, শাস্ত্রালাপ করি ।  
হংস যথা ক্ষীর খায়, নীর পরিহরি ॥  
অমৃত ভোজন করি, তৃপ্তি লাভ যার ।  
আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার ॥

সহজেতে সংস্করণ, দৃষ্টি যেই করে ।  
বৃদ্ধ হোলে সে কখন "চসমা" না ধরে ॥  
হেঁটে না হোঁচোট খায়, চলে যেই ভেজে ।  
সে কি কভু যাঁটি ধরে, বজীবুড়ী সেজে ॥

শ্রেয় আর ভক্তি হয়, সংস্করণাধার ।  
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মনে সার ॥  
ভক্তিভরে এতু পদে, যে সঁপেছে মন ।  
সে কি আর করে কভু, শাস্ত্র আলাপন ?  
বিচার, বিভর্ক তার, মনে নাহি লয় ।  
কোনমতে বাহু তার, গ্রাহু আর নয় ॥  
শাস্ত্র ছেড়ে জানী করে, জানের গ্রহণ ।  
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন ॥



## খল ও নিন্দুক ।

অহং যে হয় তার, সাধুব্যবহার ।  
 উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার ॥  
 দেখে কুঠার করে, চন্দন ছেদন ।  
 চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ ॥  
 কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ ।  
 কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ ॥  
 কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে ।  
 কোকিল অখিলপ্রিয়, সুমধুর গানে ॥  
 গুণময় হইলেই, মান সব ঠাই ।  
 গুণহীনে সমাদর, কোন খানে নাই ॥  
 শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে ।  
 যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে ?  
 অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল ?  
 উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল ?  
 ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে ।  
 ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে ॥  
 লবণ-জলধি-জল, করিয়া ভক্ষণ ॥  
 জলধর করিতেছে, সুধা বরিষণ ॥  
 সুজনে সুশয় গায়, কুশয় চাকিয়া ।  
 কুজনে কুরব করে, সুরব নাশিয়া ॥



## মিশনারি ।

যথার্থ যে মূলধর্ম, স্বতন্ত্র তাহার মর্ম,

কর্ম হেতু নাহি যায় জানা ।

নানা জাতি মানা মত, উদ্ধারের নানা পথ,

জাতিভেদ ধর্মভেদ নানা ॥

পরমেশ রূপাম্বর, এক ভিন্ন দুই নয়,

সবার উপাস্ত হন যিনি ।

শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী যত বর্ণ,

সকলের জ্ঞানকর্তা তিনি ॥

এই যে অখিল বিশ্ব, হুলরূপে হয় দৃশ্য,

সুপ্রকাশ্য শোভা অপরূপ ।

প্রকাশিয়া অমুরাগ, বহু খণ্ডে করি ভাগ,

সৃষ্টি মনুষ্য বহুরূপ ॥

যত দেখে ছিন্ন ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-চিহ্ন,

তাঁর সেই ইচ্ছা সমুদয় ।

ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা,

কিন্তু তাহে নিজে ভিন্ন নয় ॥

বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্থূল,

শুন ভাই মিশনারি মন ।



## বিষয়ে সুখ নাই ।

জন্মিলে মানুষ একা, সঙ্গী নাই কেহ ।  
কেবল আপন প্রতি, আপনার স্নেহ ॥  
একের ভাবনা মাত্র, একরূপ বলে ।  
মানুষের স্বভাবেতে, দুই পদে চলে ॥  
দ্বेष-রাগশূন্য মন, ক্ষুণ্ণ কভু নয় ।  
আপনার সম দেখে, জীব সমুদয় ॥  
সুখেতে ভ্রমণ করে, সন্তোষের বনে ।  
সহজে সহজ ভাব, লাভ হয় মনে ॥  
বিবাহ হইলে শেষ, ভাসে ক্লেশনীরে ।  
দ্বিতীয় দেহের ভার, পড়ে এসে শিরে ॥  
মনে হয় সার ঝোঁধ, অসার সংসার ।  
হিতাহিত বিবেচনা, নাহি থাকে আরি ॥  
রমণী-রঞ্জন হেতু, কামনার ফাঁদ ।  
সংসার-সাগরে বাঁধে, বিষয়ের বাঁধ ॥  
পূর্ণশরী সম শোভা, যুবতীর মুখে ।  
ঘোর ক্রুধা সুধা ভ্রমে, বিষ খায় সুখে ॥  
“ জীবুন্ধিঃ প্রলয়করী ” শাস্ত্রে এই বলে ।  
চতুষ্পদ পশু প্রায়, চারি পায় চলে ॥  
অর্থের কারণ হয়, উপার্জনে মন ।  
নানা ছল প্রতারণা, করে অবেষণ ॥

বোধহীন সদা ক্ষীণ, না বুঝে বিশেষ ।  
 দারুণ ছুঃখের দশা, প্রাপ্ত হয় শেষ ॥  
 জন্মিলে সন্তান হয়, অন্য প্রকরণ ।  
 তৃতীয় দেহের চিন্তা, উদয় তখন ॥  
 লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল ।  
 অকূল চিন্তা-অর্গবে, নাহি পায় কুল ॥  
 চতুঃপদ নাহি থাকে, ছয় পদ হয় ।  
 পশু ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেষ রয় ॥  
 ভ্রমময় মায়ামূত্রে, যুক্ত একেকালে ।  
 উর্গনাভি\* বদ্ধ যথা, আপনার জালে ॥  
 এইরূপে ক্রমে যত, বাড়ে পরিবার ।  
 মস্তকে ততই পড়ে, সংসারের ভার ॥  
 তখন অনেক ধনে, প্রয়োজন হয় ।  
 কোনরূপে নাহি রহে, কোনরূপ ভয় ॥  
 সমুদ্র লঙ্ঘন করি, অভয় অস্তুরে ।  
 অনাসে ভ্রমণ করে, দেশ দেশান্তরে ॥  
 বহুকষ্টে যদি কিছু, উপার্জন হয় ।  
 নানারূপ বিড়ম্বনা, ভোগের সময় ॥  
 রোগের প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস ।  
 নতুবা শমন করে, জীবন বিনাশ ॥

---

\* উর্গনাভি—মাকড়সা ।

যদ্যপি জীবিত ভাই, থাকে সেই জন ।  
 সুখের আশ্বাদ নাহি, পায় তার মন ॥  
 পরিবার মধ্যে নহে, সকল সমান ।  
 পরস্পর মনে মনে, মঁহা অভিমান ॥  
 যখন যাহার মনে, তুষ্টি নাহি হয় ।  
 তখনি অমনি তার, মলিনহৃদয় ॥  
 এইরূপে জর জর, বিষয়ের বিষে ।  
 বিষয়ী পুরুষ তবে, সুখী হবে কিসে ?  
 সম্পদ রক্ষণে বহু, বিপদ সঞ্চার ।  
 অতিরুষ্টি, অনারুষ্টি, অগ্নিভয় আর ॥  
 চোর-ভয়ে, রাজ-ভয়ে, ভীত প্রতিক্রম ।  
 কিরূপে মানব পায়, সুখের আসন ?  
 বিষয় বিবাদ কত, ক্রোধের নিধান ।  
 ঘেঘ, হিংসা সমুদয়, হয় বলবান ॥  
 জ্ঞাতিঘ্নে অর্থনাশ, রাজার সদনে ।  
 কদাচ না দেখে মুখ, দয়ার দর্পণে ॥  
 চিরকাল রব আমি, এই ভ্রম ধরে ।  
 মরণ নিকট অতি, মরণ না করে ॥  
 সংসারী জীবের এক, স্বতন্ত্র বিধান ।  
 আনন্দ অন্তরে তার, নাহি পায় স্থান ॥  
 পরিজন কেহ হোলে, কুকার্য্যেতে রত ।  
 তখনি লজ্জার তার, হয় মুখ নত ॥

হইলে পুন্ড্রের পীড়া, কতই জঞ্জাল ।  
 প্রতিদিন প্রাতে উঠে, পাচনের জ্বাল ॥  
 ঔষধ পথ্যের তরে, চিন্তায় মোহিত ।  
 ক্রমে ক্রমে পরামর্শ, বৈদ্যের সহিত ॥  
 মরিলে সজ্ঞান হয়, পাগলের প্রায় ।  
 শৌকে সব বল বুদ্ধি, লোপ পেয়ে যায় ॥  
 মায়ামতে মত্ত হোয়ে, মনে শোক আনে ।  
 কার পুত্র, কেবা আমি, কিছু নাহি জানে ॥  
 তাজিরা আহার নিদ্রা, হুঃখে ইরে কাল ।  
 মোহকূপে মগ্ন হোয়ে, যায় পরকাল ॥  
 হে বিভো করুণাময় ! দূর কর খেদ ।  
 মহামায়াজালপাশ, সব কর ছেদ ॥  
 বিবেক, বৈরাগ্য ছই, এ ঘোর সঙ্কটে ।  
 নিরত নিযুক্ত থাক, মনের নিকটে ॥  
 দয়া, ধর্ম, সত্য আদি, সেনাগণ যত ।  
 করুক বিপর্যয়ে, সংগ্রামেতে হত ॥  
 মিথ্যা, রাগ, প্রেতারণা, শত্রুকুল যারা ।  
 ধরতর জ্ঞান-অস্ত্রে, সব হবে সারা ॥  
 জগতে কেবল হয়, সত্যের প্রচার ।  
 মিথ্যার বাতাস যেন, নাহি বহে আর ॥  
 ভবের ভৌতিক খেলা, মিছে সমুদর ।  
 একমাত্র সত্য তুমি, বোধ যেন হয় ॥

তুমি সত্য নিত্যরূপ, এই জানি সার ।  
 আত্মরূপে বিরাজিত, হৃদয়ে আমার ।  
 যেমন তেমন তুমি, বিফল বিচার ।  
 মনোময়রূপে লহ, প্রণাম আমার ॥

—\*—

## নিপুণ ঈশ্বর ।

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সম্মান ।  
 আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥  
 বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্ ।  
 একবার, তাতে তুমি, নাহি দাও কাণ্ ॥  
 সূর্যদিকে সূর্য লোকে, কত কথা কয় ।  
 শ্রবণে স্নে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥  
 হায় হায় কর কার, মটিল কি জানা ।  
 জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে কালা !  
 মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া ।  
 অধীর হোলেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥  
 সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় সেটা ।  
 কাণ্ বুজে কান্ কর, ভাল নয় সেটা ॥  
 কার কাছে হুঃখ আর, করিব প্রকাশ ।  
 কে আর শুনিবে সব, মনের আর্দ্রাস ?  
 রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ ।

কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ ॥  
 শ্রুতির হইলে দোষ, শ্রুতি কোথা রয় ?  
 দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয় ॥

আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে ।  
 তোমার নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে ?  
 লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন ।  
 অন্ধ হোয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন ॥  
 চারিদিকে আপনার, পরিবার যারা ।  
 অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা ॥  
 তুমি যদি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে ।  
 আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে ?  
 দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন ।  
 স্মৃতির সস্তাপ তবে, কে করে হরণ ॥  
 ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর ।  
 কে আছে কাহার কাছে লাড়াইর আর ?  
 উঠ উঠ, মিছে কেন, বলি বারে বারে ।  
 জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে ?  
 অকৃতবে বুলিলাম, কাণা তুমি রটে ।  
 নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে ?  
 দর্শনেতে এত যদি না হইত দোষ ।  
 নিয়ত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ ॥



আবার কি সর্বনাশ হয়েছে অচল ।  
 শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল ॥  
 হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ ।  
 এমন পদের পতি, হারালেন পদ !

চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর ?  
 বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার ॥  
 আপনিই যদি ছুমি, পোড়েছ বিপদে ।  
 তবে আর সন্তানেরে, কে রাখিবে পদে ?  
 পদে পদে তব পদে, মন যদি রয় ।  
 আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয় ?

গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ ।  
 তা হইলে কিমে আনি, পাব বল পদ ?  
 পিতা হোয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ ।  
 তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥  
 তোমার যে পদ তাহা, আমারিতো পদ ।  
 তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ ?  
 পদ-দান ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ ।  
 তবে কেন বোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ ॥  
 কিন্তু পিতা যে সময়ে, ঘটবে বিপদ ।  
 সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ ॥

শুনিলাম আর এক, কথা ভরস্কর ।  
 নিজের তুমি ভব-কর, কিন্তু নাই কর ॥  
 এই বিশ্ব, যার করে, বিশ্ব, করে যেই ।  
 বিশ্বকর বিভূ হোয়ে, করহীন সেই ॥  
 যে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কব ।  
 কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব ?  
 বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর ।  
 অকর যদিও তুমি, নাহি ধর কর ॥  
 দিবাকর নিশাকর, দুই করকর ।  
 নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর ?  
 বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে ।  
 স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ॥  
 যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর ।  
 তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর ॥  
 বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে ।  
 নিষ্কর হইয়া কেন, নিষ্কর না দিলে ?  
 পাটা নিয়া, যে তুমি, দিয়াছ তুমি নাথ ।  
 পরিমাণ যাত্র তার, সাথে তিন হাত ॥  
 তাহাতে আমার মাটি, কাটা বনয় ।  
 কেমনে সূশস্য হবে, উর্ধ্বরাজ্যে নয় ॥  
 কেবল বাড়িছে বন, চাষ হবে কিসে ।  
 অঙ্কুরিত হোলে শুরু, কাটে কায়-কীর্ষে ॥

স্মৃতিচিহ্ন নাহি কর, হোয়ে তুমি রাজা ।  
 কিরূপে বাঁচবে প্রজা, সদা শুকো হাজা ॥  
 বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয় ।  
 প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয় ॥  
 কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাকি ।  
 জমা জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি ॥  
 করি বা কি, তার বাকি, রাখি কোন্ ভাবে ।  
 আঁখির নিমিষে ধোয়ে, বেঁধে নিয়ে যাবে ॥  
 পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ তার ।  
 না হলে স্মৃতির বোগ, কর্মভোগ সার ॥  
 তার হাতে বন্ধ আছি, হাত নাই বার ।  
 দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার ॥  
 পোড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর ।  
 মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর ॥  
 দয়া কর দয়া কর, পাতিয়াছি কর ।  
 কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥  
 না কর উপ্‌ডহস্ত, গুটাইরা রাকো ।  
 পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো ॥  
 আমায় দিয়াছ কর, কর তার লও ।  
 করে লিখি তব গুণ অনুকূল হও ।  
 প্রেম তুলি, তুলি তাহে, ভক্তি রঙ্গ দিয়া ।  
 হৃদিপটে তব রূপ রাখিব লিখিয়া ॥

মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ ।  
 তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ ॥  
 মনে, হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভাস ।  
 অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ ॥

শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব ।  
 সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব ॥  
 গন্ধবহে, গন্ধ বহে, কাছে অহরহ ।  
 তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ ॥

তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ ।  
 নিরন্তর ক্রাঘাত, করিছে অবস ॥  
 অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া ।  
 বায়ুর যাতনা সদা, রোয়েছ সহিয়া ॥  
 ক্ষরী ধরি, বজ্র বারি, করিছে প্রহার ।  
 শিশির নিরন্তর মাঝে, শিশির নীহার ॥  
 সহজে কেমনকায়, সয় সমুদয় ।  
 এ সকল যাতনায়, যাতনা না হয় ॥  
 পরম মঙ্গলময়, তুমি নিজের শিব ।  
 শিবের অশিব শুনে, কাঁদে বত জীব ॥  
 খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হোলে কাঁদি ।  
 দেখিয়া তোমার নাটে, হাসি আর কাঁদি ।

অভিধান, অভিধান, রাখিরাছে মুখ ।  
 কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ ॥  
 মুখ হোয়ে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ  
 মুক হোয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ ॥  
 অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড বারা ।  
 নাহি বুঝি মাগামুণ্ড, কি বোলেছে তারা ॥  
 শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্ গুণে ।  
 মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই গুনে ॥  
 কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম ।  
 তুমি হে, আমার বাবা, “ হাবা আশ্বারাম ” ॥  
 তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন ।  
 কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ?  
 আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় ।  
 ইসেরায় ঘাড়্ নেড়ে, সায় দিও তায় ॥  
 তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ ।  
 এই ভিক্ষে দীন সূত্রে, হওনা বিমুখ ॥  
 চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে ।  
 সে সময়ে একবার, চেও মুখ তুলে ॥  
 তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার ।  
 আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার ॥  
 গুপ্ত হোয়ে, গুপ্ত হুতে, ছল কেন কর ?  
 গুপ্ত কার ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হয় ॥

পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধোরেছি ।  
 জন্মভূমি জননী, কোলেতে বোসেছি ॥  
 তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয় ।  
 তবে কেন, গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয় ?  
 গুপ্তভাবে চিত্র গুপ্ত, চিত্র করি যবে ।  
 গুপ্ত সূতে. গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে ॥  
 আছি গুপ্ত, পরিশেষ গুপ্ত হব ভবে ।  
 বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে ?  
 গুপ্ত হোয়ে বন্ধন, মুদিব, আমি আঁধি ।  
 তখন এ গুপ্ত সূতে, কিসে দিবে ফলি ?

## শ্রীমদ্ভাগবত ।

প্রথম স্কন্ধ ।

প্রথমোধ্যায় ।

মঙ্গলাচরণ ।

“প্রকাশিত পরিদৃশ্য, বিশ্ব চরাচর ।”

সর্বভাবে সদা কাল, সর্বস্থগোচর ॥

এই জগন্তের, “সৃষ্টি”, “স্থিতি”, আর “ক্ষয়” ।

নিরূপিত নিয়মিত, বাহ্য হোতে হয় ॥

সৃজিত পদার্থ সবে, “তিনি” বর্তমান ।  
 সং-রূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ ॥  
 বিস্তারিত না থাকিলে, বিভূর বিভাস ।  
 “অসৎ জগৎ” কভু, হোতো না প্রকাশ ॥  
 “অবস্তুতে” নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার ।  
 কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার ?  
 “বন্ধ্যার সন্তান” আর, “আকাশের ফুল” ।  
 কেবল অলীক মাত্র, নাহি তার মূল ॥  
 জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি ।  
 “সিদ্ধজ্ঞান” স্বতঃ “সত্য” “সর্বগত” তিনি ॥  
 তিনিই “সর্বস্বধন”, সর্বমূলাধার ।  
 “নিরাধার” “নিরঞ্জন” “নিত্য” “নির্ঝিকার” ॥  
 বিমোহিত যে “বেদে”, বিবিধ বুধগণ ।  
 যে “বেদের” মহিমা না, হয় নিরূপণ ।  
 “আদি কবি” “বিধাতার” হৃদয় আকাশে ।  
 বাহার করুণাবলে, সে “বেদ” প্রকাশে ॥  
 “তেজ” “জল” “কাচ” এই তিনে পরস্পরে ।  
 “অসত্য” সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে ॥  
 “বিকার বিশিষ্ট বোধে” “জলত্রম” হয় ।  
 বাস্তবিক “অসত্য” সে, “সত্য” নয় নয় ॥  
 “ত্রিগুণের” সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার ॥  
 “সত্যরূপে” বোধ হয়, অখিল সংসার ॥

ফলত “অনীক” এট, মিথ্যা সমুদয় ।  
 একমাত্র “তিনি” বিনা, “সত্য” কিছু নয় ॥  
 “বিনি” হন, আপনার প্রভাবে প্রচার ।  
 “বাত্তে” নাই, কোনোরূপ, উপাধি সঞ্চারণ ॥  
 সেই “সত্য” “স্বরূপ” বিকার নাই “যার” ।  
 “পরম পুরুষ” তিনি, ধ্যান করি “স্তার” ॥ \*

—\*—

( প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । )

\* কবি ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকার মন্ত্যাহুবাদ  
 করিয়াছেন । প্রথম শ্লোকটি এই :—

জন্মাদ্যস্ত যতোহনুরাদিতরশ্চার্বেষভিজ্জঃ স্বর উ  
 তেনে ব্র কৃষ্ণদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি বৎ সুরঃ ।  
 তেজোবরিমূদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিবর্গমূধা  
 ধান্না স্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

অতি বাহুল্যভরে টীকা দেওয়া গেল না ।



## দ্বিতীয় খণ্ড ।



সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক ।



### ইংরাজী নববর্ষ ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার ।  
বিনিময়ে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার ॥ \*  
এই অবনীর করি, কত হিতাহিত ।  
একান্ন একানে ছিল, সবার সহিত ॥  
নিরন্ন বায়ন্ন দেব, ধরিয়া বিক্রম ।  
বিলাতীয় শকে আসি, করিল আশ্রম ॥  
খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর ।  
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর ॥

---

\* চাঁদ ১ বাণ ৫, পক্ষ ২ । ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২  
সালের নববর্ষ ।

চাকু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর ।  
 নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর ॥  
 মানমদে বিবি সব, হইলেন্ ফ্রেস ।  
 ফেদরের ফোলোরিস্. কুটিকাটা ড্রেস্ ॥  
 শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তার মাথা ।  
 বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে. গলদেশ ঢাকা ॥  
 চিকন্ চিকুণি চাকু, চিকুরের জালে ।  
 ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে ॥  
 বিডালান্কা বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে ।  
 আহা তার রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে ॥  
 সু প্রকাশ্য কিবা আশ্র, মৃদুহাস্তভরা ।  
 অধরে অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুপাহরা ॥  
 গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক্ ।  
 অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক্ ॥  
 মনোলোভা কিবা শোভা, আশা মরি মরি ।  
 রিবিণ্ উড়িছে কত, 'ফর্ ফর্ করি ॥  
 চল চল চল চল, বাঁকা ভাব ধোবে ।  
 বিবিজ্ঞান চলে যান, লবেজ্ঞান কোরে ॥  
 ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব, ধন্য তুই মাচি ।  
 তোম মত গুটি ছুই, পাখা পেনে বাঁচি ॥  
 স্নেহে ভাসি শুভ্রকান্তি, দম্পতী হেরিয়া ।  
 ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়া ॥

উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি, বগির উপরে ।  
 সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে ॥  
 খানার টেবিলে বসি, করি খুব তুল ।  
 এঁটে করা সেরির, গেলাসে দিই হুল ॥  
 কখনো গাউনে বসি, কভু বসি মুখে ।  
 মাজে মাজে ভিজে গায়, পাখা নাড়ী স্মখে ॥  
 নববর্ষ মহাহর্ষ, ইংরাজটোলায় ।  
 দেখে আসি ওরে মন, আয় আর আয় ॥  
 শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর ।  
 কোথার অমরাবতী, কোথা স্বর্গপুর ॥  
 সাহেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা ।  
 ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খানা ॥  
 বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট যাতে ।  
 আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥  
 কট্ কট্ কটাকট্, টক্ টক্ টক্ ।  
 ঠুনো ঠুনো ঠুন্ ঠুন্, ঢক্ ঢক্ ঢক্ ॥  
 চুপু চুপু চুপ চুপ, চপ্ চপ্ চপ্ ।  
 স্পু স্পু স্পু স্পু, সপ্ সপ্ সপ্ ॥  
 ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্, ফস্ ফস্ ফস্ ।  
 কস্ কস্ টস্ টস্, ঘস্ ঘস্ ঘস্ ॥  
 হিপ হিপ হোরে হোরে, ডাকে হোল ক্লাস ।  
 ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিস গ্লাস ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

সুখের সখের খানা, হোলে সমাধান ।  
 তারা রারা রারা রারা, সুমধুর গান ॥  
 শুড়ু শুড়ু শুম শুম, লাফে লাফে তাল ।  
 তারা রারা রারা রারা, লানা লানা লাল ॥  
 আয় লোভ চল যাই, হোটেলের সপে ।  
 এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চপে ॥  
 গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক ।  
 যত পার কোসে খাও, টেক টেক টেক ॥  
 সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি, ওই দেখ ভরা ।  
 একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরা ॥  
 করি ডিম আলুফিস, ডিসপোরা কাছে ।  
 পেট পূরে খাও লোভ, যত সাদ আছে ॥  
 গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা कह হেসে ।  
 ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিবিদের ঘেসে ॥  
 রাঙামুখ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম ।  
 ডোর্ট ক্যার হিন্দুরানী, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ।  
 পিড়ি পেতে বুয়োলুসে, মিছে ধরি নেম ।  
 মিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম ?  
 সাড়ীপরা এলোচুল, আমাদের মেম ।  
 বেরাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম !  
 সিন্দূরের বিন্দু সহ, কপালেতে উদ্ধি ।  
 নসী, জলী, ফেমী, বামী, রামী, শামী, শুদ্ধি

ধরে গেছে চিরকাল, পায় মহাছথ ।  
 কখনো দেখে না পর পুরুষের মুখ ॥  
 এইরূপে হিন্দুরা, শুদ্ধাচার রেখে ।  
 নয় পায় সুখের আলো, অন্ধকারে থেকে ॥  
 কোথায় নেটিক লেজি, বলি গুন সবে ।  
 পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে ?  
 ধন্যরে বোভলবাসি, ধন্য লাল জল ।  
 ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল ॥  
 দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, ঋষিকৃষ্ণ জয় ।  
 মেরিদাত্ত মেরিসুত, বেরিগুড বয় ॥  
 ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে থাকে ।  
 ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে ॥  
 যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব ।  
 ডুবিয়া ডবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব ॥  
 কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা ।  
 ছই হাতে পেট ভোরে, খাব খাবা খাবা ॥  
 পাতরে খাবনা লাভ, গোটুহেল কালো ।  
 হোটেলের টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো ॥  
 পুরিবে সকল আশা, ভেবোনারে লোভ ।  
 এখনি সাহেব সেজে, রাখিব না কোভ ॥\*

\* এই কবিতার এবং পরবর্তী কবিতার অনেকগুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

# পৌষ-পার্বণ ।

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা ।  
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু মঙ্গলরা ॥  
ধনু তনু শেষ, মকরের যোগ ।  
সন্ধিক্ষেপে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ ।  
মকর সংক্রান্তি জানে, জন্মে মহাকল ।  
মকর মিতিন সহ, চল্ চল্ চল্ ॥  
সারানিধি আগিয়াছি, দেখ সব বাসি ।  
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অক্ষ ধুয়ে আসি ॥  
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী ।  
একা আমি আগিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী ॥  
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে কলে ।  
রাঁধাযাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে ॥  
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক, বসত সব রাসা ।  
কুটিছে তওল সুখে, করি ধামা ধামা ॥  
বাউনি আউনি কাড়া, গোড়া আখ্যা আর ।  
মেয়েদের নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার ॥  
তুক্ তাক্ মঙ্গল, কতরূপ খ্যাল ।  
পাঁদাড়ে ফুলিচে শ্যাল, শ্যাল শ্যাল শ্যাল ॥  
খোলার পিটুলি দেন, হোরে অতি শুচি ।  
ছাঁক ছাঁক শব্দ হয়, ঢাকা দেন সুচি ॥  
উরুনে ছাউনি করি, বাউনি বাধিয়া ।  
চাউনি কর্তার পানে, কাঁছনি কাঁছিয়া ॥

টেয়ে দেখে সংসারেতে, কতগুলি ছেলে ।  
 বল দেখি কি হইবে, নর রেখ চেলে ?  
 কুদকুড়া গুঁড়া করি, কুটিলাম ঢেঁকি ।  
 কেমনে চালাই সব, তুমি হোলো ঢেঁকি ।  
 আড় করি পার দিতে, সিকি গেল গড়ে ।  
 লেখা করি নাহি হয়, আন্ পোয়া গড়ে ॥  
 ছাঁই কোরে রাখিলাম, অর্দ্ধভাগ কেটে ।  
 হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে ॥  
 ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে ।  
 তোলা তোলা খেতে দিয়া কুবাইল ঘরে ॥  
 পোয়া কাঁচা কি করিবে, নহে এক মন ।  
 বাড়ীর লোকের তাহে, নহে এক মন ॥  
 একমনে খায় যদি, আদি মনে সারি ।  
 একমনে না খাইলে, দশ মনে হারি ॥  
 ভাগ্যমণে পুরোমণ, মন যদি খোলে ।  
 পুরোমণে কি হইবে, ভাগ্যমিন হোলে ॥  
 তুমি ভাব ঘরে আছে, কত মন তোলা ।  
 জাননা কি ঘরে আছে, কত মন তোলা ?  
 কারে বা কহিব আর, বোঝা হলো দায় ।  
 খুলে দিলে, মন কিহে, তুলে রাখা যায় ?  
 বিষম ছরস্তু ওটা, মেজোবোর ব্যাটা ।  
 কোনমতে শুনেনাকো, ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা ॥

না দিলে, ধমক্ দেয়. তুই চক্ষু বেঙ্গে ।  
 ঘটি বাটি হাঁড়ি কুঁড়ি, সব ক্যালে ভেঙ্গে ।  
 পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাঁই ।  
 নারিকেল তেল শুড়, কেয় সব চাই ॥  
 অদৃষ্টের দোক সব, মিছে দেই গালি ।  
 চর্কণে উঠিয়া গেল, পার্শ্বপের চালি ॥  
 আমি লই মোটা চাল, সরু চেলে চেলে ।  
 বুদ্ধিতে না পারি তুমি, চল কোন্ চেলে ॥  
 ও বাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে ।  
 নুতন জামাই আজ, আমিবেন রেতে ॥  
 তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টান ।  
 হাবাতের হাতে যার, অভাগীর প্রাণ ॥  
 কি বলিব বাপ্ মার, কেন দিলে বিয়ে ।  
 এক দিন সুখ নাই, বরকরা নিরে ॥  
 কোন দিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে ।  
 দিবেনিশি ফেরে শুধু, গোপে তেল দিক্ ॥  
 সবে মাত্র তুই গাছা, থাকু ছিল হাতে ।  
 তাহাও দিয়াছি বাধা, মেয়েটির ভাতে ॥  
 সুখে সুখে বেড়ে গেল, কে করে খালাস ॥  
 কাচিবার সাধ নাই, মলেই খালাস ॥  
 রাত্রিদিন খেটে যরি, এক সন্ধ্যা খেয়ে ।  
 এত জালা সহ করি, আমি যাই মেয়ে ॥



এইরূপ প্রেতি ঘরে, দৃশ্য মনোহর ।  
 গিন্নির কাঁড়ুনী হয়, কর্তার উপর ॥  
 বাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম ।  
 গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রক্তনের ধুম ॥  
 সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে ।  
 ডাল্ ঝোল্ মাচ ভাত, রানি রানি রাঁধে ॥  
 কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে ।  
 সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে ॥  
 বধুর রক্তনে যদি, যায় তাহা একে ।  
 স্বাণ্ডী নন্দ কত, কথা কয় বৈকে ॥  
 হাঁলো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে ॥  
 এই রান্না শিখেছিস, মায়ের নিকটে ?  
 সাতজন্য ভাত বিনা, যদি মরি ছুখে ।  
 তখাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে ॥  
 বধুর বধুর ধনি, মুখ শতদল ।  
 সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল ॥  
 আহা তার হাহাকার, বুঝিবার নয় ।  
 ফুটিতে না পারে কিছু, মনে মনে রয় ॥  
 ভাগ্যকলে রান্না সব, ভাল হয় যার ।  
 ঠ্যাংকারেতে মাটিতে পা, নাহি পড়ে তাঁর ॥  
 হাসি হাসি মুখ ধানি, অপক্কল আড়া ।  
 বৈকে বৈকে যান গিন্নী, দিয়ে নথ নাড়া ॥

ই্যাগা দিদী এই শাক, রাঁধিয়াছি রেতে ।  
 মাথা খাও সত্তি বল, ভাল লাগে খেতে ॥  
 দিকি দিস কেন বোন, হেন কথা কোয়ে ?  
 ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক, জন্মএয়ো হোয়ে ॥  
 পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে ।  
 ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে ॥  
 এইরূপ ধুমধাম, প্রতি ঘরে ঘরে ।  
 নানা মত অনুষ্ঠান, আহারের তরে ॥  
 তাজা তাজা ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোলে ।  
 স্মারি স্মারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে ॥  
 কেঁহু কা পিটুলি মাখে, কেহু কাই গোলে ।

\* \* \*

আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর ।  
 গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার ॥  
 বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা ।  
 হার হার দেশাচার, ধন্য ভোর খেলা ॥  
 কামিনী কামিনীবাগে, শয়নের ঘরে ।  
 স্বামির খাবার জব্য, আয়োজন করে ॥  
 আদরে খাওয়াবে সব, মনে মাখ আছে ।  
 ঘেসে ঘেসে বসে গিন্না, আসনের কাছে ॥  
 মাথা খাও, খাও বলি, পাত্রে দেয় পিটে ।  
 না খাইলে বাকামুখে, পিটে দেয় পিটে ॥

আকুলি বিকুলি কত, চুকুলির লাগি ।  
 চুকুলি গড়িয়া হন, চুকুলির ভাগী ॥  
 প্রাণে আর নাহি সয়, ননদের জালা ।  
 বিষমাথা বাক্যবাণে, কাণ হুলো কালা ॥  
 মেজো বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড় ।  
 কুমারের পোনে যেন, পোড়ে পোড়ে পোড় ॥  
 মনোহুখে প্রাতে আজ, কুটি মাই খোড় ।  
 এখনো রয়েছে তাই, কোন্‌দলের তোড় ॥  
 স্বাশুড়ী আলাদা রেখে, ছাঁই তিন হাঁড়ী ।  
 চুপি চুপি পাঠালেন, কন্যাটির বাড়ী ॥  
 ঠাকুরির ছেলে গুলো, খায় ঠেসে ঠেসে ।  
 আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে ॥  
 মরি মরি ষাট্ ষাট্, কেঁদেছিল রেতে ।  
 বাছা মোর পেটপুরে, নাহি পার খেতে ॥  
 শক্তি ভক্তি পরায়ণ, হন যেই নর ।  
 তখনি এসব বাক্যে, ভেসে দেন ঘর ॥  
 উপাদেয় দ্রব্য সব, গড়িয়াছে চলে ।  
 সদ্য হস্ত কৰ্ম্ম শেষ, গোটা ছই খেলে ॥  
 কামিনী-কুহকে পড়ি, খায় যেই ভাবা ।  
 নিজে সেই হাবা নয়, হাবা তার বাবা ॥  
 বুকে পিটে গুড়পিটে, গুড় পিটে গড়ে ।  
 হিঁহর দেবতা সম, ঠাট্ তার ধড়ে ॥

ভিতরে পুরিয়া ছাঁই, আলু দেয় ঢাকা ।

\* \* \*

লোভ নাহি খেমে থাকে, খাই তাই চোটে  
পিটে পুলি পেটে যেন, ছিটে গুলি ফোটে ॥

পায়সে পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুসি ।

গৃহিণীর অনুরাগে, শুদ্ধ তাই চুষি ॥

যুবো সব সুবো প্রায়, খুবো নাহি নড়ে ।

কাছে বোসে খায় কোসে, রোসে নাহি পড়ে ॥

ধন্য ধন্য পল্লীগাম, ধন্য সব লোক ।

কাহনের হিসাবেতে, আহারের যৌক ॥

প্রবাসী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে ।

ছুটি নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে ॥

সহরের কেনা জবো, বেড়ে যার জাঁক ।

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক ॥

কর্তাদের গালগল্প, শুদ্ধ ক টানিয়া ।

কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া ॥

ছই পার্শ্ব পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে ।

চিটে শুদ্ধ ছিটে দিয়ে, পিটে খান্ন কোসে ॥

তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া ।

ভাষায়া করিছে সুখে, জামাই লইয়া ॥

আহারের জবা গয়ে, কোশল কোতুক ।

মাঝে মাঝে হাসরবে, সুখের যৌতুক ॥

## ছয় মিশনরি ।

ডুজ্জ হিংস্রক বটে, তারে কিবা ভয় ?  
মণি মন্ত্র মহৌষধে, প্রতীকার হয় ॥  
মিশনরি রাজা নাগ, দংশে ভাই যারে ।  
একেবারে বিষদাঁতে, সেরে ফ্যালাে তারে ॥  
ব্যাস্ত্র-ভয়ে ব্যগ্র হই, যদি পায় বাগে ।  
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি, ভয় করি বাঘে ?  
হেদো বনে\* কেঁদো বাঘ, রাজামুখ যার ।  
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে, নাম শুনে তার ॥  
বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে ।  
ধরিয়া ধর্মের গলা, নখে ফ্যালাে চিরে ॥  
ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে ।  
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে ॥  
কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায় ।  
মিশনরি ছেলেধরা, ছেলে ধয়ে থায় ॥  
মাতৃমুখে জুজু কথা, আছি অবগত ।

---

\* হেছরা পুষ্করিনীর পার্শ্বস্থ, এই অর্থ ।

এই বুঝি সেই জুজু, রাঙ্গামুখ যত ॥  
 চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান ।  
 কাণকাটা \* \* \* কেটে নেবে কাণ ॥  
 ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে ।  
 বাটা ভরে পান দেব, গালভরে খাবে ॥  
 চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিব শুড়পিটে ।  
 কাপধন বাছা মোর, ছেড়নারে ভিটে ॥  
 কি জানি কি ঘটে পাছে, বুঝি তোর কাঁচা ।  
 ওখানে জুঁজুর ঝঁর, যেওনারে বাছা ॥  
 মূর্থ হয়ে ঘরে থাক, ধর্মপথ ধরে ।  
 কাজ নাই ইস্কুলেতে, লেখা পড়া করে ॥  
 হ্যাদেহে ছেলের বাপ, মন্দ বড় কাল ।  
 আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল ॥  
 মিষ্টভাষী শুভ্রাকার, মিশনারি যত ।  
 আমাদের পক্ষে তাঁরা দয়া-ধর্মহত ॥  
 পিতার সুখের নিধি, তনয় রতন ।  
 কিছু নাহি বুকে তার, মনের মতন ॥  
 শূন্য করি জননী, হৃদয়ভাঙার ।  
 হরণ করিয়া লয়, সাধের কুমার ॥  
 বাক্যের কুহক যোগে, ঈশ্বর ছেড়ে ।  
 যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥  
 কামিনীর কোলশূন্য জুগ্ম মন তার ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

১৩

এ খেদ কহিব কারে হায় হার হার ॥  
বিদ্যাদান হল করি, মিলনরি ডব ।  
গাতিয়াছে ভাল এক, বিধর্মের টব ॥  
মধুর বচন কাণে, জানাইয়া লব ।  
ঈশ্বরে অতিথিক করে শিশু সব ॥  
শিশু সবে জাগকর্তা, জ্ঞান করে ডবে ।  
বিপরীত লবে পোড়ে, ডুব দেয় টবে ॥



## পাঁটা ।\*

রসভরা রসায়, রসের ছাগল ।  
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল ॥  
স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্তা, জননী তোমার ।  
উদরে তোমার ধরে, ধন্য গুণ তার ॥

---

\* কবি ভ্রমণকালে আহার লক্ষ্যে অনেক কষ্ট পাইয়া,  
পরে একটি পাঁটা পাইয়া, ছাশির সহিত ভোজন পূর্বক এই  
প্রায়শন করিয়াছিলেন।

## কবিতাসংগ্রহ ।

তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান ।  
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান ॥  
ত্রিতাপেতে ভরে লোক, তব নাম নিয়া ।  
বাচালে দক্ষের ঔষধ, নিজ সুখ দিয়া ॥  
টানযুখে টাপদাড়ি, গালে নাই গোঁপ ।  
শূন্য খাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে খোপ ॥  
সে সময়ে অপক্লম, মনোলোভা শোভা ।  
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কয় বোবা ॥  
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা ।  
দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা ॥  
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে ।  
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গরু খুঁকে ॥  
শুধু ফার পেট ভোরে, পঁটারাম দাদা ।  
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকে বাধা ॥  
শাদা কালো কটারুপ, বলিহারি গুণে ।  
সাত পাত ভাত মারি, ত্যা ত্যা রব শুনে ॥  
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ ।  
তোমার প্রসাদে যার, সকল বিবাদ ॥  
জ্বাল দিতে কাল-যায়, মাল পড়ে গালে ।  
কাটনা কায়াই হয়, বাটনার কালে ॥  
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লোয়ে ।  
হাড়গুরু গিলে কেলি, হাড়গিলে হোয়ে ॥



মজাদাতা অজ্ঞা তোর কি লিখিব যশ ?  
 যত চুবি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস ॥  
 গিলে গিলে ঝোল খায় আশ্বাদনহত ।  
 তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত ॥  
 এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা ।  
 মোরে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা ॥  
 দেখিয়া ছাগের গুণ কোরে অভিমান ।  
 হইলেন বরাক্রম নিজে ভগবান ॥  
 তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান ।  
 ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান ॥  
 হোট্টেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে ছাম্ ।  
 পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ॥  
 অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লোরে ।  
 লুকায়ে আছেন জলে কুর্ম মীন হোরে ॥  
 কঙ্কপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে ?  
 যাচে কিছু আছে মান বাঙ্গালির কাঁছে ॥  
 কিন্তু মাচ পাঁটার নিকটে কোথা রয় ?  
 দাসদাস তন্তু দাস তন্তু দাস নয় ॥  
 এক দুই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয় ।  
 পাঁচেরে করিলে হাতে রিপু রিপু নয় ॥  
 তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি ।  
 বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥

পাত্র হরে পাত্র লয়ে চোলে মারি চাটি ।  
 ঝোলমাথা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি ॥  
 টুকি টাকি টুক্ টুক্ মুখে দিই যেটে ।  
 যত পাই তত খাই সাধ নাহি যেটে ॥  
 ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু ।  
 লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু ॥  
 সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা ।  
 ত্রিভুবনে তোর কাছে নিছু নাই মজা ॥  
 কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে ।  
 এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে ॥  
 মহতের কার্য কর গরিবানা চলে ।  
 না জানি কি হোতো আরো যত ক্ষীর খেলে ॥  
 বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী ।  
 জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী ॥  
 বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে ।  
 কসাই অনেক ভাল গোসায়ের চেয়ে ॥  
 পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের ছহিতা ।  
 ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥  
 ছলে এক মল্ল বলি বলিদান লোয়ে ।  
 খান দেবী পিতৃ-মাতা বিখ্যাতা হোয়ে ॥  
 দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হোয়ে ।  
 করিলেন ভুটিনাশ কালীঘাটে রোয়ে ॥

প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে ।  
 দেবী-বরে জন্মে তার। \* \* ঘরে ॥  
 এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায় ।  
 কলীর দেবল হোয়ে কালী-গুণ গায় ॥  
 প্রণমামি \* \* তোমার চরণে ।  
 পেটেভোরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে ॥  
 প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী ।  
 অদ্যাবধি না হইবা কল্লার জননী ॥  
 প্রণমামি কলীঘাট যথা মাতা কালী ।  
 প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি ॥  
 ধন্য ধন্য কৰ্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া ।  
 প্রণমামি তব পদে দিয়া গাজ নাড়া ॥  
 এমন সুখের ছাগে করে যেই ঘেষ ।  
 তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥  
 বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা ।  
 বানাইব কুঁড়াজ্বালি দিয়া ছাগ-ছালা ॥  
 নামাবলী বহির্কাস নিয়া করতলে ।  
 ভালকোরে ছোপাইব কুধিরের জলে ॥  
 সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব ।  
 পশু-গন্ধে পশুদের বাবে পশু-ভাব ॥  
 ফের যদি করে ঘেষ হোয়ে প্রতিবাদী ।  
 ঘুচাব গোঁড়ামি রোগ দিয়া ছাগনাদী ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া ।  
 অস্ত্রে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া ॥  
 মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি ।  
 পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি ॥  
 তাহাতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর ।  
 নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার ॥  
 হয় একি অপরূপ বিধাতার খেলা ।  
 শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা ॥  
 লোম তুলি করি তুলি রঞ্জে রঙ্গ ভরি ।  
 শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুখে চিত্র করি ॥  
 চিত্র করে চিত্র করে দিয়া স্মরণরেখা ।  
 দেবমূর্তি অবয়ব সব যায় লেখা ॥  
 নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে ।  
 শ্রীহরি-গৌরঙ্গগুণ বাজে তালে তালে ॥  
 ঢাক কাড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল ।  
 তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল ॥  
 এক চর্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তার কল ।  
 নেড়ানেড়ী গৌড়াদের ভিকার সম্বল ॥  
 কোপ্লীধারী প্রেয়দাস সেবাদাসী নিরে ।  
 ঘারে ঘারে ভিকাকরে ধঞ্জনী বাজিয়ে ॥  
 সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে ।  
 আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥

ছাড়িকাঠে ফেলে দিই ধোরে ছুটা ঠ্যাং ।  
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ॥  
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা ।  
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা ॥  
ক্রমে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে ।  
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে ॥  
প্রতিদিন প্রাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন ।  
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যেজন ॥  
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বোলে ।  
সাতার পুরুষ তার স্বর্গে যায় চোলে ॥



## বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্তি ।

যেখানেতে বালকের, বিপরীত মতি ।  
সেখানেই মিশনরি, বলবান অতি ॥  
পাতিয়া কুহকী ফাঁদ, ফেলিয়াছে পেড়ে ।  
এমন মুখের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে ?  
গাচপাকা মর্ত্তমান, বর্ত্তমান চোকে ।  
বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে কোকে ?

তুমি ত সুবোধ চণ্ডী, বৈষ্ণবের ছেলে ।  
 কোথা যাও মনোহর, মাল্‌সাভোগ ফেলে ?  
 হিন্দু হলে কেন চল, সাহেবের চেলে ?  
 উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ খেলে ॥  
 ক্ষীর সর ননী খেলে, বৃদ্ধি কর কারা ।  
 বিধর্ম-ডোবার জল, খেয়েনা হে ভারী ॥  
 যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয় ।  
 আর ভাই ঘরে আর, কিছু নাই ভয় ॥  
 কত কারখানা করে, খেতে দিব খানা ।  
 গোটুহেল ডোর্ট ক্যার, কে করিবে মানা ?  
 সরপোটে বোসে খাব, খুসি মেরা খুসি ।  
 যদি কেহ কিছু বলে, ধরে দেগা ঘুসি ॥  
 আহার বিহারে ভাই, ভয় কার কাছে ?  
 ধর্মসভা নাহি লয়, ব্রহ্মসভা আছে ॥  
 আপন বিক্রমে হব, কুসীরার কিং ।  
 টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিরা রিং ॥  
 গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে ।  
 পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে ॥  
 জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহ, মারা রূপ গণ্ডী ।  
 লমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে, কেন হও দণ্ডী ?  
 পূর্ববৎ হিন্দু হও, যিগুমত ধণ্ডী ।  
 হাড়িবী চণ্ডীর আজ্ঞা, ঘরে আর চণ্ডী ॥

# বড়দিন ।

( দ্বিতীয় )

শ্রীষ্টের জনমদিন, বড় দিন নাম ।  
বহু সূখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম ॥  
কেরানী, দেয়ান আদি, বড় বড় মেট ।  
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট ॥  
ভেট্‌কি কমলা আদি, মিছরি বাদাম ।  
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম ॥  
এই পর্বে গোরী সর্বে, সুখী অতিশয় ।  
বাল্লারি বিদিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥  
“কেথলিক” দল সব, প্রেমানন্দে দোলে ।  
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে ॥  
বিশ্বমাঝে চাকুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা ।  
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা ॥  
স্বপ্নযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে ।  
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥  
ও গড্‌ ও গড্‌ গড্‌, লেখে বাইবেলে ।  
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরষের ছেলে ?

এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে ।  
 বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে !  
 নিজের বীজের ফল, জঁপু যদি হয় ।  
 দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয় ॥  
 দিশী কৃষ্ণ, রিসি কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ ।  
 উভয়ের কার্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥  
 বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার মাতৃ ।  
 এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার বাতৃ ॥  
 খুলিয়া পুরাণ গীতা, ভাবে চোলে চোলে ।  
 কব তার সব গুণ, অবতার বোলে ॥  
 কুমারীর গর্ভে শিশু, হোয়ে অবতার ।  
 করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার ॥  
 বিভূরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে ।  
 ভুলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে ॥  
 ধর্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ ।  
 ভূতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেঘ ॥  
 শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্গী, যুগি জোলা জেলে ।  
 সবে বলে এই প্রভু, জঁখরের ছেলে ॥  
 নাম জারি করিলেক, চেলা সব ঠাই ।  
 শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গৌসাই ॥  
 পাপী পরিভ্রাণ হেতু, করুণানিধান ।  
 জুশের জুশের ঘারে, ভেজিলেন প্রাণ ॥



তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব ।  
 প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব ॥  
 সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে চল চল ।  
 গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী দল ॥  
 প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি ।  
 আহারে অহ্লাদ পান, যত মিশনরি ॥  
 টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ ।  
 মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ !  
 ভুবন করেছে বন্ধ, কুহকের ডোরে ।  
 হার রে “কুমারীপুত্র” বলিহারি তোরে ॥  
 যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব প্রকরণ ।  
 কেথলিক চর্চে গিয়া, দেখে এসো মন ॥  
 দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে ।  
 ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে ॥  
 ওল্ড এক টেব্লেমেন্ট, গোল্ড তার বাঁধা ।  
 কোল্ড করে মাহুষেরে, লাগাইয়া বাঁধা ॥  
 রিফরম প্রটেষ্টান্ট, বিশপের দল ।  
 বড়দিন পেরে মুখে, হাস্ত খল খল ॥  
 মিলিটারি, সিভিল, বণিক আদি যত ।  
 ছুটী পেরে ছুটাছুটা, আফালন কত ॥  
 জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে ।  
 চর্চে যান সুরূপসী, শ্রীমতীর মনে ॥

বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি ।  
 ক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেব্লেমেন্ট ধরি ॥  
 ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট ।  
 সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম্ ছুট ॥  
 আলায়েতে আগমন, মনের খুসিতে ।  
 অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে ॥  
 পরম্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ ধানা ।  
 টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নানা ॥  
 বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে ।  
 আনন্দের আলাপন, আহারের কালে ॥  
 শক্তি সহ তক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ ।  
 হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ ॥  
 রসে মত্ত ছেড়ে তব্ব, প্রেমতব্ব লাভে ।  
 হোয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥  
 রণবেশী মিলিটারি, যত সব গোরা ।  
 মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোরা ॥  
 হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া ।  
 বিবির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া ॥  
 চোট পাট জোট পাট আয়োজন কোরে ।  
 শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধোরে ॥  
 বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে ।  
 পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥

ইচ্ছা করে ধরা পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে ।  
 কুক্ হোয়ে মুখ খানি, লুক্ করি স্মুখে ॥  
 বিধাতা যদিপি করে, গাড়ির সহিস্ ।  
 আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্ ॥  
 সাজিয়া ক'উচ্‌ম্যান, উপরে উঠিয়া ।  
 ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া ॥  
 আঙ্গুস্, পিঙ্গুস্ আদি, ডিকুস্, মেণ্ডিস্ ।  
 ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা, গমিস ॥  
 জেস্, নেস্, কেস্ আর, টেঁস্‌গণ যত ।  
 ঝাঁকে ঝাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত ॥  
 পোরে ডেস্, হন ফ্রেস্, দেখা যায় বেড়ে ।  
 বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে ॥  
 পুঁইখাড়া চিঙিড়ির, কোরে ভুট্টিনাশ ।  
 ম্যাম্ সজে, নানা রজে, গরিমা প্রকাশ ॥  
 চুণাগলি অধিবাস, খোলার আলয় ।  
 তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥  
 ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি ।  
 লিছু যাও কেলাম্যান্, নেটিব বেঙালি ॥  
 জুতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই চেই ।  
 রূপি বিনা রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই ॥  
 বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই ।  
 জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥

তেঁতুলে-গদী যেন, কিরিন্দির ঝাঁক ।  
 বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো ঝাঁক ।  
 আনাক্যাষ্ট কন্বট, গৃহত্যাগী যারা ।  
 কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা ॥  
 নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, ছলু, হিরু ।  
 গলু, থলু, হলু, তলু, হারু, আর ছিরু ॥  
 এদিকে ছুঁথের দায়, মনে বোলে ফাঁসি ।  
 বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ু কীর হাসি ॥  
 ছেঁড়া পচা কামেজ, তাহার নাই হাতা ।  
 তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা ॥  
 ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া ।  
 ঈশু-ভাষে খানা খান, বাছ বাজাইয়া ॥  
 মনে মনে খেদ বড়, কাগ্না হয় রেতে ।  
 পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে ॥  
 যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাসন্ ।  
 বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেব ধরণ ॥  
 পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের পঞ্চায় ।  
 ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার ॥  
 বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ক্যালা ।  
 চুপি চুপি, বহরুগী, লুকাচুরি খ্যালা ॥  
 দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা ।  
 কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা ॥

ফেস্-ভিস্-ভরা ডিস্, মধ্যে ভাতে ভাত ।  
 সে পাত স্পাত নয়, নিপাতের পাত ॥  
 অখিল ভরিয়া স্মখে, করে জলসেবা ।  
 যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কেবা ?  
 উরি মধ্যে ছঃখিতর, বঙ্গি সব ভেয়ে ।  
 তব্হত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে ॥  
 তেড়া হোরে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে ।  
 গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে ॥  
 কোনোরূপে পিণ্ডি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে ।  
 শুদ্ধ হন খেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে ॥  
 “এ, বি” পড়া ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে ।  
 মাজিয়েছে গাঁদা-গাদা, ডেক্সের উপরে ॥  
 পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অল্পে মারে তুড়ি ।  
 ভাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি ॥  
 শাসনের ভরে নাহি, যায় উপবনে ।  
 পায়সে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥  
 ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয় ।  
 বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয় ॥  
 সাহেবের ছড়াছড়ি, জাহুবীর জলে ।  
 করিতেছে “বোটরেস” সেলর সকলে ॥  
 হায় রে স্মখের দিন, শোভা কব কার ?  
 ইংরাজটোলার গেলে, নয়ন জুড়ায় ॥

প্রতি গেটে গাঁদা-হার, কারিগুরি তাতে ।  
 বিরচিত ছটা চাকু, দেবদাকু-পাতে ॥  
 হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার ।  
 ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানি, রাখিব না আর ॥  
 জেতে আর কাজ নাই, দীপ্ত-গুণ গাই ।  
 খানা সহ নানা স্মৃথে, বিবি যদি পাই ॥  
 চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে ।  
 তোতে মোতে থাকি আর, হিঁদুয়ানি ছেড়ে ॥  
 ছেড়োনা ছেড়োনা আর, বিপরীত বাণী ।  
 থাকো থাকো থাকো বাপু, রাখো হিঁদুয়ানি ॥  
 এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে ?  
 আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে ?  
 কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই ।  
 পূর্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥  
 পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত ।  
 সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥  
 অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ ।  
 করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ ॥

# নীলকর ।

—  
প্রথম গীত ।

( কবির সুর । )

মহড়া ।

কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা,

কাতরে কর করুণা ।

মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখে আর নাহি পর্শে,

প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে ।

এমন স্বোণার বর্ষে, খাসের বর্ষে,

কেবল বর্ষে যাতনা ।

“আসিয়া” আসিয়া মাগো করুণাময়ী,

করুণাচক্ষে দেখনা ॥

নামেতে নীলের কুটি, হতেছে কুটি কুটি,

হুখীলোক্ প্রাণে মারা যায় ।

পেটে খেতে নাহি পার ।

কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্পে বাইরে শাদা,

ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,

পেঁকো গন্ধ তার ।

ওমা একে মন্টার ফোঁসফুঁসুনি,  
 ধুনোর গন্ধ তায় ।  
 হোলে চোরের কাছে ধর্ম-কথা,  
 মর্ম কভু বোঝে না ॥

চিতেন ।

হোলো নীলকরেরদের অনররি  
 মেজেষ্টরি ভার ।  
 কুইন মা, মা, মাগো ।  
 হোলো নীলকরেরদের অনররি  
 মেজেষ্টরি ভার ।

পড়েছে সব পাতর্ বন্ধে, অভাগা প্রজার পক্ষে,  
 বিচারে রক্ষে নাইকো আর ।  
 নীলকরের হৃদ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে,  
 দেশে উঠেছে এই ভাব ।

যত প্রজার সর্বনাশ ।

কুটিরাল বিচারকারী, লাটিরাল সহকারী,  
 বানরের হাতে হোলো কালের খোস্তা,  
 লোস্তাজলে চাব ।

হোলো ডাইনের কোলে ছেলে সোপা,  
 চীলের বাসার আচ ।

হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,  
 শুনেনি কেউ শুনবে না ॥



অন্তরা ।

প্রজা ধোচ্ছে আর মাচ্ছে তারা এককালে,  
পিটেতে মাচ্ছে খুব কোড়া ।  
কাটাঘায়ে লুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,  
যেন ঘোদের উপর বিষফোড়া ॥

চিতেন ।

হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ভা, ঘটে সর্বনাশ ।  
কাল সাপ কি কোনকালে, দয়াতে ভেকে পালে,  
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥  
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না ?  
হয়েছি চিরকালে দাস ।  
করি শুভ অভিলাষ ।  
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,  
শিখিনি সিং বাঁকানো,  
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস ॥  
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,  
গামলা ভাঙে না,  
আমরা তুমি পেলেই খুসি হব,  
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥

## অন্তরা ।

জমি চুনচে, দিন গুণচে, কেবল বুনচে বীজ,  
 দোহাই না শুনচে একটী বার ।  
 নীলের দাদন, ঠেঙ্কার গাদন, বাঁদন চমৎকার,  
 করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥

## চিতেন ।

তোমার, সাধের বাঙলা, হোলো কাংলা,  
 সয়না অত্যাচার ।  
 বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা,  
 লাটের দিনু খাজনা হয় না আর ।  
 কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অল্পুগত,  
 জানিনে মন্দ আচরণ ।  
 পূজি তোমার শ্রীচরণ ।  
 আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,  
 মনেতে রাঙা আলো,  
 টুকটুক্ টুক্ সিঁদুরে বরণ ।  
 রাজবিজ্ঞোহিতা করে বলে, স্বপ্নে জানিনে,  
 কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,  
 তোমার জন্মের বাসনা ॥

# দ্বিতীয় গীত ।

( কবির সুর । )

মহড়া ।

ভাল কার্য্যটি ধার্য্য করে যদি গো,

এই রাজ্যটি করেছ মা খাস ।

এসে এদেশেতে বসৎ কর,      অন্নপূর্ণা মূর্তি ধর,

অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ ।

সব অন্নভূমি কর তুমি,      তুলে নিরে নীলের চাষ ।

কোথা মা পায়ের ধরি,      হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী,

সন্তানের পূরাও অভিলষি ॥

হল রান্নাঘরে কান্নাহাটি,      ধন্য পড়ে লাঠালটি,

উদরে অন্ন কারো নাই ।

দোহাই, মা, তোমার দোহাই ।

কেহ রয় নীরাহারে,      কেহ রয় নিরাহারে,

যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ,      ওগো মা,

তবেই রক্ষা পাই ।

নাই উন্ন জালা,      একি জালা,

জালায় নাইক জল ।

আবার পোড়া ভাগ্গি, সকল\_ম্যাগ্গী,  
উপবাসে উপবাস ॥

### চিতেন ।

তুমি বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে ।  
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,  
শুভদিন দিন মা ভারতে ॥  
কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে,  
কে বুঝে তোমার লীলে ?  
নিলে মা এই ভারতের ভার ।  
পেয়ে শুভ সমাচার ।

মা তোমার হবে ভাল, আশাতে দিলেন আলো,  
সুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো,  
ভেদ রবেনা আর ॥

যত নীলের শাদা, মূলুকটাদা, শাদা কেহ নয়,  
কোরে নীলের কর্ষ, কি অর্ধর্ষ,  
মনে কালী হয় প্রকাশ ॥

### অস্তুরা ।

না বুনলে নীল, মেরে কিল,  
“কিল” করে, নীলকরে !

দেশের ছোটকর্তা, দিলেন্ তাদের,  
হর্তা কর্তা কোরে ।  
জোরে বেঁধে আনে ধোরে ॥

চিতেন ।

যেমন কাজীরে সুখালে পরে, হিঁহুর পরব নাই,  
'তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার,  
গোস্বামী ভক্ণের গৌসাই ।  
একেতো মাগু গি গণ্ডা, লুটেল তার কুটেল ষণ্ডা,  
তারাতো ঠাণ্ডা কেহ নয় ।  
লুঠে এণ্ডা বাচ্ছা নয় ।  
গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্রাকুল কাঁটা,  
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে,  
এখন মা, প্রাণ নিয়ে সংশয় ।  
গেল গরু জরু, তুণ তরু, কিছু নাহি আর ।  
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট,  
সমান কষ্ট বারমাস ॥

---

## তৃতীয় গীত ।

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি ।

“বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হরে”—সুর ।

ওমা কুইন্ তোমার, ইঞ্জিয়া ধাম্,  
কুইন কোরোনাকো ।

যদি স্বেণার ভারত, খাস্ কোরেছ,  
বান্ কোরে, মা, থাকো থাকো ।

শান্ত্রে বলে পরামর্শে,  
আপন চক্ষে স্বেণা বর্ষে,  
তুমি এলে ভারতবর্ষে,  
হর্ষে হবে সব ।

চারিদিকে উঠচে শুধু, জয় জয় জয় রব ॥

প্রজাগণে কোলে টেনে,  
ছেলে বলে ডাকে ডাকো ॥

বঙ্গবাসী আমরা যত,

অমুরত অমুগত,  
অবিরত করি কত,  
শুভ বাসনা ।

জয় জয় জয় বিষ্টোরিয়া, মুখে ঘোষণা ।

“চোরে খেকো দোয়া করু” .

এমন কোথাও পাবেনাকো ॥ .

অন্নবিনে ঘরে ঘরে,

অনাহারে প্রাণে মরে,

পরম্পরে উচ্চস্বরে,

করে হাহাকার ।

দিনান্তরে উদরপুরে অন্ন মেলা ভার ।

হুখী যারা, পড়ে মারা,

প্রাণে কেহ বাঁচেনাকো ॥

যে আশুগ লেগেছে চলে,

চলেনা কেউ নিজ চলে,

চলে চলে জাহাজ ঠেলে,

ভাস্ময়ে দিচ্ছে চাল ।

কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট,

কারে দিব গাল ?

কিছু দিন মা ! দয়া করি,

রপ্তানিটি বন্দ রাখো ॥

বঙ্গবাসী শত শত,

বিদ্রোহেতে হোলো হত,

পরিবার ছিল যত,

ধনে প্রাণে হল কাঙালী,

ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙ্গালী ।

চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে,  
চেলের জাহাজ চলোনাকো ॥

নূতন চলে হবে শস্তা,  
ঘটিল তার কি অবস্থা,  
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের,  
কাঁটা হয়না রোধ ।  
চার মণের দাম্ এক মণে লয়,  
মণের মনে ক্রোধ ।

মনের চলে মন ভেঙেছে,  
ভাঙা মন আর গড়োনাকো ।

পেয়ে নব রাজাদেশ,  
নীলকরেতে শাসে দেশ,  
নাহি মানে উপদেশ,  
না করে উদ্দেশ ।

বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদা ঘেব ।

‘কালো বলে বাঙালীদের’  
ভাল দেখতে পারেনাকো ॥

যেখানেতে বাঘের ভয়,  
সেই খানেতেই সন্ধ্যা হয়,  
নীলকরের করেতে হোলো,  
মাজিষ্টরি ভার ।



এর বাড়ি মা, প্রজা লোকের, বিপদ নাইকো আর ।

খেদাইনে তোর উঠান চসি,

বান্ধব রাখেনাকো ॥

কতক নীলের কর্ণকার,

কাজে যেন চর্মকার,

নাহি ধারে ধর্মধার,

মর্ম বোঝা ভার ।

ঠিক ধর্মহীন ধর্মভার, ধর্ম-অবতার ।

কটু কথার কলতরু, রায়ুন গরু, বাছেনাকো ॥

চাষার হাতে খোলা দিলে,

নীলে সকল জমি নিলে,

জমিদার সব কাচা ঢিলে,

চীলের মুখে মাচ ।

ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন্, কাচেন্, কাপের কাচ ।

সাপের কাছে কেঁচো যেন,

সাত চড়ে 'রা' কোটেনাকো ॥

তুমি সর্বভবকরী,

বিলাত—ভারতেশ্বরী,

বিপদে শ্রীপদে ধরি,

কর করুণা ।

রমনা দিন প্রজার তোমার, সন্ননা যাতনা ।

কৃপাকরী, কৃপা করি, শ্রীচরণে রাখো রাখো ॥

কি পাগেতে এমন হোলো,  
 অকালে আকালে মোলো  
 ধূষ্টি বিনে, সৃষ্টি পুড়ে,  
 গেল ছারেখার ।

বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ,      ভরসা কিসে আর ?  
 এ দেশের হৃদিশা এমন,  
 হয়নিকো আর হবেনাকো ॥  
 কুটিয়ালের মেজেষ্টরি,  
 লাঠীয়ালের রেজেষ্টরি,  
 এ আইন হয়েছে জারি,  
 মার্কে আমাদের ।

আইনকর্তার পেটের বার্ভা,      পেয়েছি মা টের,  
 বাতে অবিচারে প্রজা মরে.  
 এমন আইন রেখনাকো ॥



## চতুর্থ গীত ।

### মহড়া ।

চার্ টাকা মণ দর্ উঠেছে, নূতন চলে ।

কত আর চল্বো নূতন চলে ?

যাদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা,

বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥

### অস্তুরা ।

ওমা বিষ্টোরিয়া, “আসিয়া” আসিয়া,

দেখ মা ! বসিয়া, নয়ন মেলে ।

বল কে করে পালন, কে করে শাসন,

একেবারে সব্, মোরে গেলে ॥

ছঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার,

করে হাহাকার. মেয়ে ছেলে ।

ঘরে গিল্লী পাড়ে গাল্, ফুরাইলে চাল্,

কিসে রাখি চাল্, চলে চলে ?

যারা খেতো সরু চাল্, চালে মোটা চাল্,

সিদ্ধ পক কোরে, আড়ে গেলে ।

আমরা খাই শুধু মোটা, নাহি ঘর কোটা,  
 বেঁচে যাই মোটা, খেতে পেলে ॥

শুধু চাল বলে নয়, দ্রব্য সমুদয়,  
 বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে ।

দর বেড়েছে চার গুণ, বিধাতা বিগুণ,  
 ঝাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জ্বলে ॥

তেল, স্বত, দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি,  
 শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে ।

বত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি,  
 কিনে খাই টাকা হাতে এলে ॥

শুনে জিনিষের দর, গারে আসে অর,  
 ছুটে যাই ঘর বাড়ী ফেলে ।

ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হোয়ে রই,  
 কাটের মুকদ বনি হাতে গেলে ॥

ঘরে না থাকিলে কাট, করি কাট কাট,  
 নিজে হই কাট, চকু তুলে ।

ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়,  
 চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে ॥

যেখানে যেখানে সেখানে, কেবা করে মানে,  
 ভোতো না যাতনা, একলা হোলে ।

দেখে দুখের বাড়াবা ছী, ফিরি বাড়ী বাড়ী,  
 মাথায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে ॥



বাঘের গোবধে কি ভয় ?      প্রজা নাহি রয়,  
 তারা খেলে খেলে সব, খোরে খেলে ॥  
 গুন ওগো কুপামই,      মনের দুখ কই,  
 ওমা, আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে ?  
 অপি দিবল রজনী,      জননী জননী,  
 ঠেলো না চরণে, কেলো বোলে ॥  
 মাগো, করি স্মবিচার,      স্মত সবাকার,  
 ঘুচাও হাহাকার, কোয়ে বোলে ।  
 দেশে বড় ডামাডোল,      উঠেছে এই বোল,  
 নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥

## পঞ্চম গীত ।

( রামপ্রসাদী সুর । )

সেথা, চের্ আছে তোর রাঙা ছেলে ।  
 আছে আছে গো, সেই বিলাতে, মা !  
 চের্ আছে তোর্ রাঙা ছেলে ।  
 হেথা আস্বিনি কি তাদের্ কেলো ?  
 এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার্,  
 দেখতে হয় মা নয়ন মেলে ।

অস্তুরা ।

থাকো থাকো থাকো তুমি,  
 রাঙা ছেলে কোরে কোলে ।  
 ওমা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি,  
 কালামুখো কাঙাল বোলে ?  
 কালো ছেলে যত আছে,  
 কেলোসোণা " তোমার কাছে, মা গো !  
 এই কালোর ভিতর আলো আছে,  
 ভালো কোরে দেখ জেলে ॥  
 দেহ কালো, কালো নই,  
 ভিতরেতে কালো কই ?—মাগো !  
 যারা কালোমনের মানুষ, তারা,  
 হিংসে কোরে কালো বলে ।  
 কুপুত্র যদ্যপি হই,  
 তোমা ছাড়া কারো নই, মা গো !  
 তবু দয়া করি দয়ামই,  
 রাখতে হবে চরণতলে ।  
 কুপুত্র অনেক হয়,  
 কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো !  
 তুমি জগতের মা, আমাদের মা,  
 ডাকবো জগদম্বা বোলে ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

“ ইণ্ডিয়া ” কোরেছ খাস,  
 পুরাও গো মা অভিলাষ, মা গো !  
 ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ,  
 রক্ষা কর ভাতে জলে ।

অন্নপূর্ণা নাম ধর,  
 অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো,  
 যেন আকালেতে অকালে মা !  
 কাল-কুটিরে যাইনে চলে ।

যাতনা সহেনা আর,  
 ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গো,  
 যেন নামের নৌকা ডোবে না মা !  
 কলুক-সাগরের জলে ।

ভারতের কর্তা ব্যাস,  
 ভারত ছাড়া নাহি চলে,  
 তোমার এই ভারতের এমন দশা,  
 ভারতে না খুঁজে মেলে ।

সেফারে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,  
 দিয়ে উদোর পিণ্ড বুদ্ধোর ঘাড়ে,  
 বাঙালীকে কাটতে বলে !

রাজভক্ত অনুরক্ত,  
 তোমার সব বাঙালী ছেলে,  
 এরা ধর্ম-পথে সদাই রত,



অধর্ম করে না মোলে ।  
বাজে সাহেব বেদী যারা,  
কত কটু কহে তারা মা গো !  
কেবল তোমার চরণ, কোরে স্মরণ,  
ভাস্তে থাকি নয়নজলে ।  
বলে যত গো-বানর,  
গবর্ণরে গবানর, মা গো !  
ওমা “ কেনিং ” কত “ কনিং ” নন্,  
বলী তিনি ধর্মবলে ।  
“ হ্যালিডে ” আর, “ বিডন ” আদি,  
ধর্মবাদী সত্যবাদী, মা গো !  
ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি,  
এরা দেশে আছে বোলে ।  
দয়াদানে বাঁচয়েছেন সন,  
পাপের কথা পারে ঠেলে ।  
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে,  
কোথার যেতেম রসাতলে ।  
এঁদের গুণে আছে রাজ্য,  
এঁদের গুণে চলছে কার্য্য, মা গো !  
এখন এমন বিধি কর ধার্মা,  
রাফো যেন স্মোণা ফলে ।  
সম্প্রতি এক বিষয় বিধি,

## কবিতাসংগ্রহ ।

পাশ হয়েছে ছলে কলে,  
 এক কলসী ছখে ঘোলের ছিটে,  
 নীলকরে রাজত্ব পেলে !  
 মরে প্রজা, মরে চাষা,  
 যেজির গর্ভে সাপের বাসা, মা গো !  
 থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে  
 বাদ্ করে মা ! কদিন চলে ?  
 বলে যারা জ্বরদস্ত,  
 তাদের ঘরে লাভের গুস্ত, মা গো !  
 যেন মস্তপদের মাঝে হয়ে,  
 হেলিডের পদ নাহি টলে ।  
 বাঙলা দেশের কর্তা যিনি,  
 কুটি কুটি করেন তিনি, মা গো !  
 তাই দেখে শুনে ভয় পেয়ে মা !  
 কত লোকে কত বলে ।  
 কেহ বলে অংশধারী,  
 কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো !  
 নিতে অত্যাচারের গুঁড়তক,  
 চক্র কোরে বেড়ান্ চলে ।  
 যার মনে যা উদয় হয়,  
 সেই কথাটা সেই তো কর মা গো !  
 আমি জানি তিনি ধর্মময়,

ধর্ম আছে করতলে ।  
দাঁতে কুটো কোরে মা গো !  
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে ।  
দিয়ে দরাদৃষ্টি-বৃষ্টিধারা।  
দৃষ্টি রাখো স্মরণে !  
মা ! তোমার শুভ হোক,  
শত্রু সব ক্ষয় হোক, মা গো !  
তারা একেবারে হবে ধ্বংস,  
বংশ না রয় ধরাতলে ।  
ভারতের জ্বর দিবে যারে,  
এই কথাটি বোলো তারে, মা গো !  
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,  
কার্য করে কুতূহলে ॥



# ছুভিক্ষ ।

প্রথম গীত ।

বাউলটানী সুর ।

রাগিনী দেশমোনার—তাল আড়ধেমটা ।

হয় ছুনিয়া ওলট্ পালট্,

আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে ?

আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে ?

পোড়া আকালেতে নাকাল করে,

ভামাভোল পেড়েছে ভবে ।

আমরা হাটের নেড়া, শিক্কে খোর,

ভিক্কে কোরে রেড়াই সবে ।

হোলো সকল ঘরে ভিক্কে মাগা,

কে এখন্ আর ভিক্কে দেবে ?

যত কালের যুবো,                      যেন সুবো।

ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে ।

খোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,

ভিখারী কি অন্ন পাবে ?

যদি অনাথ বায়ুন হাতপেতে চায়,  
 সুসি ধোরে ওঠেন তবে !  
 বলে, গতোর আছে, খেটে খেপে,  
 তোর পেটের ভার কেটা হবে ?  
 যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া,  
 তাদের কাছে কেটা চাবে ?  
 বলে, জৌ বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,  
 কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে ।  
 আমি স্বপনে জানিনে বাবা,  
 অধঃপাতে সবাই যাবে ।  
 হোরে হিঁদুর ছেলে, ট্যাসের চেলে,  
 টেবিল পেতে থানা খাবে ।  
 এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,  
 খেদ কোরে আর কে বোঝাবে ?  
 ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,  
 জুতো পারে দেখতে পাবে ।  
 হোলো কর্মকাণ্ড, লণ্ডু ভণ্ড,  
 হিঁদুমানী কিসে রবে ?  
 যত ছুধের শিশু, ভোজে জীণ্ড,  
 ডুবে মোলো ডবের টবে ।  
 আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,  
 ব্রত ধর্ম কোর্তো হবে ।

একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,  
 আর কি তাদের তেমন পাবে ?  
 যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে,  
 কেতাব হাতে নিচে যবে ।  
 তখন "এ, বি, " শিখে, বিবি সেজে,  
 বিলাতী বোল কবেই কবে ॥  
 এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,  
 সাজ সৈজোতির ব্রত গায়ে ?  
 সব কাঁটা চাম্চে ধোরবে শেষে,  
 পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ?  
 ও ভাই ! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,  
 পাবেই পাবেই দেখতে পাবে ।  
 এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,  
 গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ।  
 আছে গোটাকত বুড়ো যদি,  
 তদিন কিছু রক্ষা পাবে ।  
 ও ভাই ! তারা মোলেই দফা রক্ষা,  
 এককালে সব ফুরিয়ে যাবে ।  
 যখন আসবে শমন, কোরবে দমন,  
 কি বোলে তার বুঝাইবে ?  
 বুঝি "ছট" বোলে, "বুট" পারে দিয়ে,  
 "চুকট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে ।

ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা,  
রাতের বিয়ের ছকুম যবে ।  
তায় নীলকরেরদের মেজেটিরি,  
কেমন কোরে ধর্মে সবে ?  
ওভাই ! তত দিন তো খেতে হবে,  
যত দিন এ দেহ রবে ।  
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো,  
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে ।  
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,  
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে ।  
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না,  
কেঁদে মরি হাহারবে ।  
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে,  
কেমনে সে শুকনো খাবে ?  
মরি মেগে মেগে, \* \*  
মাচ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে ।  
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই !  
কতক্ষণে রাত পোয়াবে ?  
হোলো নিরামিষে শরীর শুষ্ক,  
আমিষের মুখ দেখবো কবে ?  
ওরে “ উড়ো ধই গোবিন্দায় নম ”  
এই ব্যবস্থা ধরি সবে ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

এস “ অক্ষয় দস্তে ” গুরু কেড়ে,  
 “ বাহ্য বস্তু ” পড়ি তবে ।  
 যত জাত কুটুম্ব বেয়রা হোয়ে,  
 খাটে কোরে ঘাটে লবে ।  
 দেশের কর্তা যত কাল হনেন,  
 কাণ পাতেন না কারা রবে ।  
 গিয়ে মানের কাছে নালিশ করি,  
 বিলাতধামে চল সবে ॥

## দ্বিতীয় গীত ।

### বাউলের সুর ।

রাগিনী ভৈরবী—তাল পোস্তা ।  
 ওগো মা, বিক্টোরিয়া, কর্গো মানা,  
 কর্গো মানা ।  
 যত তোর রাজা ছেলে, আর যেন মা !  
 চোক রাঙেনা, চোক রাঙে না ॥  
 প্রজা লোকের জাতি ধর্ম,  
 কেহ যেন জোর করে না ।



যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে,  
 দিচ্ছে মা, যে ঘোষণা ।  
 ওমা, জাতিভেদে, ভজন সাধন,  
 ধর্মমতে আরাধনা ।  
 মহা অমূল্য ধন, ধর্মরতন,  
 এমন ধনতো আর পাবো না ।  
 যত মিশনরি এ দেশেতে,  
 এসে করে কি কারখানা ।  
 তারা ঈশ্বর কাণে ফুঁকে,  
 শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা !  
 ফেরে হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে,  
 নানা ঠাটে, ফন্দি নানা ।  
 বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,  
 ঈশ্বরীষ্ট কর ভজনা !  
 ওমা হেদো বনে কেঁদো চরে,  
 তার ভয়েতে প্রাণ বাচে না ।  
 তার পাশে “ ছমো ” ছতুমখুমো,  
 ঘুমো ছেলের জাত রাখে না ।  
 যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী,  
 “ ছেলেধরা ” প্রতি জনা ।  
 এরা জননীর কোল শূন্য কোরে,  
 কেড়ে নিচ্ছে ছুধের ছানা ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

সদা ধর্ম ধর্ম কোরে মরে,  
 ধর্ম-ধর্ম কেউ বোঝে না ।  
 হোরে পরের ধর্ম, ধর্ম হবে,  
 এইটী মনে বিবেচনা ।  
 যেন আপন ধর্ম আপ্নি পালে,  
 পরের ধর্ম নাশ করে না ।  
 এদের ধর্ম-পথের স্বাধীনতা,  
 রেখোনা না, আর রেখোনা ।  
 কেমন কুহক জানে এরা,  
 উপদেশে করে কাণা ।  
 ওয়া বংশ গিও ধ্বংস কোরে,  
 কৃত ছেলে খেলে খানা ।  
 নর ভোয়ার অধীন, স্বাধীন এরা,  
 কেমন কোরে কোর্কে মানা ?  
 ওয়া, আয়রা সেটা বুঝতে পারি,  
 খোঁটা লোকে তা বোঝে না ।  
 তুমি সর্কেশরী যদি তাদের,  
 চোক রাঙায়ের কর মানা ।  
 ভবে টুপি খুলে, আঙড়া তুলে,  
 পালিয়ে যাবার পথ পাবে না ।  
 নগর কমিশনের যারা,  
 তাঁদের একি বিবেচনা ।

একি প্রাণে সহে ঝাঁড় দিয়ে যা,  
 ময়লাফেলার গাড়ী টানা !  
 ওয়া ছুঁক যিনে মরি প্রাণে,  
 হিঁচু লোকের প্রাণ বাঁচে না ।  
 যত শাদা লোকের অত্যাচারে,  
 গরু বাছুর আর বাঁচে না ।  
 যত দেশের গরু ভুট কোরেছে,  
 টেবিল পেতে খেয়ে থানা ।  
 এরা খাড়ী শুক দিচ্ছে পেটে,  
 আস্ত ভগবতীর ছানা ।  
 একে রামে রক্ষে নাইকো,  
 সুগ্রীব তার হল সেনা ।  
 যত দিশি ছেলে কোপ্চে উঠে,  
 চাল চেলেছে সাহেবানা ।  
 কারে কব হুংখের কথা,  
 কাণ পেতে যা কেউ শোনে না ।  
 যারে দেবতা বলে পূজা করি,  
 তাতেই হোলো বিড়ম্বনা ।  
 যারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে,  
 করে কত হিত সাধনা ।  
 আর ছুঁক দিয়ে জীবন বাঁচার,  
 ভূণ খেয়ে প্রাণধারণা ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

“ গরু তরু ” কল্পতরু,  
 'এমন তরু আর হবে না ।  
 ফলে “ গরুগাছে ” দধি, ছুঁক,  
 সর, নবনী, ঘৃত, ছানা ।  
 মনের হুঃখে বুক ফাটে মা,  
 বোলতে গেলে মুখ ফোটে না ।  
 যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে,  
 এমন গাছে দিচ্ছে ছানা ।  
 ওমা, গোহত্যাটা উঠয়ে দেহ,  
 অতর পদে এই বাসনা ।  
 মাগো সকল গরু ছুরয়ে গেলে,  
 ছুঁক খেতে আর পাব না ॥  
 খাবার দ্রব্য অনেক আছে,  
 তাই নিয়ে মা চলুক খানা ।  
 ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস  
 নী খেলে পর প্রাণ বাঁচে না ॥  
 ঘোণার বাঙাল, করে কাঙাল,  
 ইয়ং বাঙাল যত জনা ।  
 সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,  
 কাণে লাগায় কোঁস কোঁসনা ॥  
 এরা, না “হিহ,” না “যোছেলিমান,”  
 ধর্মধনের ধার ধারে না ।

নয় “মগ”, “ফিরিঙ্গী”, বিষম “ধিঙ্গী”,  
ভিতর বাহির যায় না জানা ।  
ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হোয়ে,  
ঘটায় কত অঘটনা ।  
এরা লোণা জল, ঢোকালে ঘরে,  
আপন হাতে কেটে খানা ।  
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,  
শুরঙ্গ তার রঙ্গ নানা ।  
তাতে বিধবাদের “কুলতরী”,  
অকূলেতে কুল পেলে না ।  
কুলের তরী থাকলে কুলে,  
কুলের ভাবনা আর থাকে না ॥  
সে যে অকূল-সাগর, দারুণ ডাগর,  
কালো পানি বড় লোণা ।  
যখন সাগরে চেউ উঠেছিলো,  
তখনি গিয়েছে জানা ॥  
এর দফরা খেয়ে নফরা যত,  
কোরে বসে কি এক খানা ।  
তখন কর্তারা কেউ শুনলেন না তো,  
লক্ষ লক্ষ হিঁড়র মানা ॥  
এরা বাঘেরে করিলেন শিকার,  
কাঁদে করি ইছুর ছানা ॥

উদবধি রাজ্যে তোমার,  
 উঠেছে এক কুরটনা ।  
 ওমা, আমরা বুঝি মিছে সেটা,  
 অবোধে প্রবোধ মানে না ॥  
 “ কালবিল ” \* কাল্ বিল্ কোরেছেন,  
 হিঁহর ভাতে ঘোর যাতনা ।  
 তুমি রাতের বিয়ে তুলে দিয়ে,  
 ছিঁড়ে ফেলো আইনখানা ॥  
 ওমা, যে পাপে হোক প্রজা মরে,  
 চার টাকা দর, চাল্ মেলে না ।  
 দেখ অনাহারে, প্রজা মরে,  
 মা খেয়ে আর প্রাণ বাঁচেনা ॥  
 ওমা, যত বাবু, হোলো কাবু,  
 আর চলে না বাবুয়ানা ।  
 যারা আঙ্গুর পেস্তা দিত ফেলে,  
 তারা এখন চিবোর চানা !  
 বড়মানবী দূরে থাকুক,  
 ভালো কোরে গেট চলে না ।  
 এখন্ কেমন্ কোরে চড়বে গাড়ী,  
 জোটেনাকো ঘোড়ার দানা !

শাসন পালন করেন যাঁরা,  
হোলেন তাঁরা কালা কাণা ।  
ওমা, না খেয়ে সব প্রজা মরে,  
নাইকো সেটা দেখা শোনা ।  
কত বার মা পোড়েছিলো,  
দরখাস্ত কত থানা ।  
বলেন “ ফিরি টেরেড ” বন্দ কোর্টে,  
কোনো কালে কেউ পারে না ॥  
চেলের বাজার শস্তা কর,  
পুরাও গো মা সব বাসনা ।  
তবে দুঃখী লোকের আশীর্বাদে,  
আপদ বিপদ আর হবে না ॥  
শিবসন্তেন কোচ্ছি তোমার,  
মহামন্ত্র আরাধনা ।  
আছে মহারথী সেনাপতি,  
ভগবতীর উপাসনা ॥  
হুর্গানামের হুর্গ গেঁথে,  
রেখেছি মা “সেলেথানা ” ।  
তাতে গুলি গোলা, সকল তোলা,  
ভক্তি অস্ত্র আছে শাণা ॥  
আছে মনশিবিরে সজ্জা কোরে,  
সংখ্যা হয় না কত সেনা ।

## কবিতাসংগ্রহ ।

আছে জোড়া ঘোড়া সত্য, ধর্ম,  
 উড়ে যাবে ধরে ডেনা ॥  
 এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,  
 ভেবো না মা, সে ভাবনা ।  
 সেই “তাতিয়া তোপির” মাথা কেটে,  
 আমরা ধরে দেব “নানা ॥”



## আচার ভ্রংশ ।

কালশুণে এই দেশে, বিপরীত সব ।  
 দেখে শুনে মুখে আর, নাহি সরে রব ॥  
 এক দিকে দ্বিজ ভূষ্ট, গোলাভোগ দিয়া ।  
 আর দিকে মোলা বোসে, যুর্গি মাস নিয়া ॥  
 এক দিকে কোশাকুশী, আয়োজন নানা ।  
 আর দিকে টেবিলে, ডেবিলে খায় থানা ॥  
 ভূতের সংসারে এই, হোয়েছে অদ্ভুত ।  
 বুড়া পূজে ছুতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত !  
 পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ক্যালে কেটে ।  
 বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে !



বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব, জশু-ভাব শিশু ।  
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে ঈশু ॥  
হাসি পায় কান্না আসে, কব আর কাকে ?  
যায় যায় হিঁচুয়ানী, আর নাহি থাকে ॥  
ওহে কাল কালরূপ, করালবদন ।  
তোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন ॥  
দেব দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার ।  
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার ॥  
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে ।  
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম খেয়ে ?  
দোহাই দোহাই কাল, শান্তিগুণ ধর ।  
উঠ উঠ পান লও, আঁচমন কর ॥



# বাবাজান বুড়াশিবের স্তোত্র । \*

রঙ্গবিলাস ছন্দ ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ।

কিসে ভূমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস্ শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্ ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

শ্রীধাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর ।

বিশ্বমাঝে অপক্লপ, দৃশ্য মনোহর ॥

কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, ভূমি বুড়া শিব ।

তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব ॥

---

\* Marshman যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া দেশে  
যান, তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কবিতা লিখিয়া, তাঁহাকে বিদায়  
দেন । হুইজনে বড় বনিবনাও ছিল না ।

শুভ্রদেহ ভূতনাথ, তোলা মহেশ্বর ।

গঙ্গার তরঙ্গ তব, মাথার উপর ॥

কখনো প্রথর বেগ, কভু থম্ থম্ ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস শিক্কে, ভম্ ভম্ ভম্ ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

---

“ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া” বৃষভে আরোহণ ।

অহঙ্কার অলঙ্কার, ভূজঙ্গ-ভূষণ ॥

পক্ষপাত হাড়মালা, সদা সুশোভন ।

মিথ্যা, ছল, তোষামোদী, ত্রিশূল ধারণ ॥

ধূম্রপান ছল তব, কাগজের কল ।

উর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্, জ্বলিছে অনল ॥

দমে দমে দমবাজী, নাহি ধাও দম ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ।

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস শিক্কে, ভম্ ভম্ ভম্ ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

---

টাউন্সেণ্ড †, রবার্টসন ‡, নন্দী ভূঙ্গী ছটো ।  
 নিয়ত নিকটে আছে, দাঁতে করি কুটো ॥  
 ছাই-ভয়-বিভূষিত এ টোকাটা খায় ।  
 গালবাদ্য করি সদা, বগল বাজায় ॥  
 “ডেবিল” ছপাশে তারা, টেবিল ধরিয়া ।  
 “এবিল” হতেছে সুখে, তোমার স্মরিয়া ॥  
 কাজ ভাল, লাজহীন, রাজপ্রিয়তম্ ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥  
 কিসে তুমি কম ?  
 বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম ।  
 বন্ বন্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

লাঞ্চার বাঘছান, বঞ্চনার ঝুলি ।  
 এক মুখে পঞ্চানন, সাধে বলি শুলী ॥  
 তিরস্কার পুরস্কার, অতুল বিভব ।  
 নিজ নিন্দা শ্রবণেতে, হোয়ে থাক শব ।

---

† Meredith Townsend যিনি পরে লণ্ডনে Spectator পত্রের সম্পাদক হইরাছিলেন । শ্রীরামপুরে ইনি “সমাচার দর্পনের” সম্পাদক ছিলেন ।

‡ তখনকার Government Translator.

কালীরূপে কালী তব, হৃদয়ে বিহরে ।  
 সৃষ্টির মড়ার কাঁথা, জমা আছে ঘরে ॥  
 ত্রিভুবন জর করে, তব পরক্রম ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস শিল্পে, ভম্ ভম্ ভম্ ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

কাউন্সিল কোচের গৃহে, বড় সমাদর ।  
 অনুরক্ত ভক্ত তব, যত গবানর ॥  
 সিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে ।  
 হরে হরে বাবাজান, বাবাজান হরে ॥  
 ষোড়শোপচারে পূজা, তক্তে করে যোগ ।  
 মন্দিরে বসিয়া স্মৃথে, খাও রাজভোগ ॥  
 তোমার গুণের কেহ, নাহি পায় ফম্ ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস শিল্পে, ভম্ ভম্ ভম্ ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

“ধর্মতলা” ধর্মহীন, গোহত্যার ধাম ।  
 “ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া” সেরূপ তব নাম ॥  
 বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর ।  
 “ফ্রেণ্ড” হয়ে, ফ্রেণ্ডের, খেয়েছ তুমি আর ( R ) ॥  
 কত ভাব ধর তুমি, কত ভাব ধর ।  
 রাজায় করিলে খুন, গুণ গান কর ॥  
 ভ্রমিতে অন্টার পথে, কিছু নাহি ভ্রম ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ।  
 কিসে তুমি কম ?  
 বাজাও ব্রিটিস শিক্কে, ভম্ ভম্ ভম্ ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥



কালো তুমি শাদা কর, শাদা কর কালো ।  
 আলো কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো ॥  
 স্থলেরে আকাশ কর, অকাশেরে স্থল ।  
 জলেরে অনল কর, অনলেরে জল ॥  
 কাঁচারে বানাও পাকা, পাকা কর কাঁচা ।  
 সাঁচারে বানাও ঝুঁটো, ঝুঁটো কর সাঁচা ॥  
 কাঙ্গালির ছুখদাতা, বাঙ্গালীর ঘম্ ।  
 বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ।  
 কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্ ।  
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

---

শুনিতেছি বাবাজান, এই তব পণ ।  
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ, বিলাত গমন ॥  
যোড়করে পশুপতি, করি নিবেদন ।  
সেখানে কোরোনা গিয়া, প্রজার পীড়ন ॥  
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি, সঙ্গে লোয়ে যাও ।  
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও ?  
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, টম্ টম্ টম্ ।  
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ।

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্ ।  
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

---

## তৃতীয় খণ্ড ।

ঋতু বর্ণন ।

---

শ্রীম্ম ।

আরক্তা বাঁচিনে প্রাণে, বাপ্ বাপ্ বাপ্ ।  
বাপ্ বাপ্ বাপ্ একি, শুষ্কটের দাপ ॥  
বিষহীন হোরে গেল, বিষধর সাপ ।  
ভেক তার বুকে মুখে, মারিতেছে লাক ॥  
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাঁপ ।  
বার বার কত আর, জলে দিব বাঁপ ?  
প্রাণে আর নাহি সয়, তপনের তাপ ।  
শূণ্য হতে পড়ে যেন, অনলের চাপ ॥  
বিকল হোতেছে সব, শরীরের কল ।  
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥)

---



কি করে করুণ অতি, রবি মহাশয় ।  
 অরুণ ত নয় এ যে, অরুণতনয় ॥  
 কি গুণ দেখিয়া লোকে, মিত্র তারে কয় ?  
 মিত্র যদি মিত্র, তবে শত্রু কোথা রয় ?  
 এই ছবি এই রবি, খর অতিশয় ।  
 নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয় ?  
 পিতৃগুণ পুত্রে হয়, এই ত নিশ্চয় ।  
 পিতা হোয়ে রবি ব্যাটা, পুত্রগুণ লয় ॥  
 জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

---

ছাঁরখার হইতেছে, অখিল সংসার ।  
 ঘোরি রিষ্টি যার সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর ॥  
 কিবা ধনী কিবা দীন, কেহ নাই সুখে ।  
 সবাঁকার শবাঁকার, হাহাকার মুখে ॥  
 ক্ষণ মাত্র কেহ আর, নাহি হয় স্থির ।  
 কার সাধ্য দিনে হয়, ঘরের বাহির ?  
 শমনতাঁতের তাতে, বালি তাতে ভাই ।  
 তাতে যদি পড়ে পদ, রক্ষা আর নাই ॥

## কবিতাসংগ্রহ ।

তখন অচল হোয়ে, পড়ে ভূমিতল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ।  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেৱে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

জল বিনা জলাশয়ে, মরে জলচর ।  
 কেমনে বাঁচিবে বল, স্থলবাসী নর ?  
 পশু পক্ষী আদি করি, ভূচর খেচর ।  
 একেবারে সকলেরি, দহে কলেবর ॥  
 শীতল হইবে বোলে, যদি যাই বনে ।  
 বনের বিরহে তথা, সুখ নাহি মনে ॥  
 তরুতলে তাপ দেয়, মায়ারূপা ছায়া ।  
 উপরে তপন বধে, নীচে তার জায়া ॥  
 হাবা হোয়ে ছুটি বাবা, দেখে দাবানল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেৱে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

বায়ু হোল রাগহত, ভাগ নাই তার ।  
 শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার ॥  
 ভাব দেখে বোধ হয়, হইয়াছে মৃগি ।  
 তার কাছে গুরে আছে, মৃগ আর মৃগী ॥

হরি হরি ঘেঁষ ভাব, ডাকে হরি হরি ।  
 করী আছে তার কাছে, প্রেমভাব করি ॥  
 একঠাই রহিয়াছে, রাক্ষস বানর ।  
 ময়ূর ভুজকে নাই, বন্দ পরম্পর ॥  
 ছেড়েছে ধলতা রোগ, যত সব খল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥



হায় হায় কি করিব, রাম রাম রাম ।  
 কত বা যুচিব আর, শরীরে ঘাম ?  
 টস টস করে রস, ঝরে অবিশ্রাম ।  
 দারুণ দুর্গন্ধ গায়, পোচে যায় চাম ॥  
 ঘামাচি ঘামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে ।  
 পূবের বাঁদাল চাচা, যত বাবু ভেয়ে ॥  
 নধাঘাতে হয়ে যায়, সব অঙ্গ খোলা ।  
 সাক্ষাৎ পরেশনাথ, বব বম ভোলা ॥

\* \* \*

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ।  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ॥  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ।

আকাশে না শুনি আর, সলিলের নাম ।  
 বিরস হইল গাছে, রসময় জাম ॥  
 শুখায়ৈ সকল শাখা, ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা ।  
 কালরূপ যুচে তার, হইয়াছে রান্ধা ॥  
 নারিকেল শুখাইল, হোয়ে জলহারা ।  
 বেতাল হইয়া তাল, শাঁসে যায় মারা ॥  
 কোষেতে ধরেছে দোষ, জল না পাইয়া ।  
 কাঁটাল হইল জেঠা, এঁচড়ে পাকিয়া ॥  
 জল বিনা মধুহীন, হোলো মধুফল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদের বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥



হইলে মধ্যাহ্ন কাল, কি প্রমাদ ঘটে ।  
 জীবন শুখাতে থাকে, কলেবর ঘটে ॥  
 ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপাশ ।  
 আই চাই করে খাই, পাখার বাতাস ॥  
 পাখার পবনে প্রাণ, কত যায় রাখা ।  
 বোধ হয় সে বাতাসে, হতাশনমাখা ॥  
 নিদারুণ নিদাঘেতে, নাহি পরিজ্ঞান ।  
 জগতের প্রাণ নাশে, জগতের প্রাণ ॥

অমিল করিছে বৃষ্টি, প্রবল অনল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

---

উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী কি প্রকার ।  
 শাখার উপরে করে, পাখার প্রহার ॥  
 কাতর হইয়া কত, কাঁদিতেছে দুখে ।  
 অবিরত, হা জল যো জল, বলে মুখে ॥  
 ক্ষণ মাত্র নীচু পানে, নাহি চায় ফিরে ।  
 উর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল চিরে ॥  
 তবু ঘন নাহি হয়, সদয়হৃদয় ।  
 খেয়েছে কাণের মাথা, নীরদ নিদয় ॥  
 পিপাসায় মারা যায়, চাতকের দল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

---

আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু ।  
 দাঁতে কেটে, থু করে, ফেলিয়া দিই নিচু ॥

পাত পেতে, ভাত খেতে, বিষ বোধ হয় ।  
 ভাল ঝোল বাহা মাখি, কিছু ভাল নয় ॥  
 সুধু মাত্র, যেছে খাই, অশ্বলের মাছ ।  
 নিকটে না আনি আর, কশ্বলের \* গাছ ॥  
 কেবল অশ্বল রস, সম্বল করিয়া ।  
 পেটের ধম্বল পাড়ি, টম্বল ধরিয়া ॥  
 তবু পোড়া দেহ মম, না হয় শীতল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥



গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ, দৃশ্য ভয়ঙ্কর ।  
 সৃষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর ॥  
 শাখীপরে আঁখি মুদে, আছে পাখী সব ।  
 চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব ॥  
 কোকিল কাতর হয়ে, কাননে ভ্রমিছে ।  
 ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে, গলা ভাঙ্গিতেছে ॥  
 বিরল বিপিন মাঝে, মার করি গাছ ।  
 ধার্মিক হইয়া বক, নাহি ছোঁয় মাছ ॥

ভুতল কুঁড়িয়া তাপ, পোড়ায় নিতল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

---

ভাবি মনে নিক্ক হব, সরোবরে নেয়ে ।  
 পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে ॥  
 সে জলে অনল জলে, গুড়ে হই থাক ।  
 ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গারে মেখে পাঁক ॥  
 কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ ।  
 ডাগর হইল পেট, সাগর সমান ॥  
 বোতলের ছিপি খুলে, যদি খাই সোঁদা ।  
 তার তার বোদা লাগে, মুখ হয় জোঁদা ॥  
 উদরে খেলিয়া চেউ, করে কল কল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

---

উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার ।  
 কিঙ্ক হয় উপবাসে, উপবাস সার ॥

তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল, নিলে তার বাস ।  
 অনলের আভা এসে, নাকে করে বাস ॥  
 উষা আর উষসিতে, তরুতলে বাস ।  
 কিঞ্চিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস ॥  
 গুণগুণ, গুণ ভুলি, আছে অন্ধকারে ।  
 অলি আর বলী নয়, কলি দলিবারে ॥  
 হইল সুবাসহত, কমলের দল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥



মাট আছে কাঠ হয়ে, ফুটিফাটা মাটি ।  
 কোথা জল, কোথা হল, কোথা তার পাটি ॥  
 হোরে চাষা, আশাহারা, হার হার বলে ॥  
 কাঁদিয়া ভিজার মাটি, নয়নের জলে ॥  
 শশুরের গ্রীষ্মব্যাটা, দস্যু অতিশয় ।  
 কুণ্ডির কল্যাণ-কথা, কভু নাহি কর ॥  
 কপালে আঘাত করে, নীলকর যারা ।  
 রবি-করে সারা হোরে, যারা গেল চারা ॥  
 আকাশ চাহিয়া আছে, কাছে রেখে হল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥



জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

—•—

নগরের দক্ষিণেতে, যত খেত নর ।  
খাটারে খসের টাটি, মুড়িরাছে ঘর ॥  
তাহাতে চামের জল, ঢালে নিরন্তর ।  
তখাচ শীতল নাহি, হয় কলেবর ॥  
ও গড ও গড বলি, টবেতে উলিয়া ।  
মনোহর হাঁসা মূর্তি, কামিজ খুলিয়া ॥  
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে ।  
কেবল চাইস \* ভরা, আইসের † পরে ॥  
সুখায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল ।  
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ।

—:~:—

মণ্ডালোষা দধিচোষা, চোসা দল যত ।  
কোষাধরা গৌসাম্ভরা, তপে জপে রত ॥  
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে ।  
পূজার আসনে বসে, মন্ত্র যায় ভুলে ॥

\* ইচ্ছা ।

† বরফ ।

শিবেরে ঠেকায় কলা, কলা আগে চায় ।  
 খপ করে তুলে নিয়ে, গপ করে খায় ॥  
 ভূতপালে ফেলে দিয়া, নিজ পেট পালে ।  
 কোষা ধরে চক্ চক্, জল ঢালে গালে ॥  
 না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল, আগে চায় ফল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

—:~:—

একেবারে মারা যায়, যত টাপদেড়ে ।  
 হাঁস কাঁস করে যত, প্যাজথেগো মেড়ে ॥  
 বিশেষতঃ-পাকা দাড়ি, পেটমোটা ভুঁড়ে ।  
 রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥  
 কাজি, কোলা, মিয়া মোলা, দাঁড়িপাল্লা ধরি ।  
 কাছাখোলা, তোবাতাল্লা, বলে আলা মরি ॥  
 দাড়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায় ভেসে ।  
 বৃষ্টি জল পেরে যেন, ফুটিয়াছে কেশে ॥  
 বদনে ভরিছে সুধু, বদনার নল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥

—•—

হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ ।  
 যার ধর্ম একি কর্ম, হয় মর্মভেদ ॥  
 স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ ।  
 নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ ॥  
 সধবা হইল যেন, বিধবার প্রায় ।  
 কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায় ॥  
 সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে ।  
 ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে না রাখে ॥  
 আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা আর মল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥



\* কোথায় বরুণ হায়, কোথায় বরুণ  
 বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুণ ॥  
 লুকায়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুণ ।  
 এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুণ মরুণ ॥  
 ঘন ঘন, ঘন দল, চরুণ চরুণ ।  
 জীবের সকল দুখ, হরুণ হরুণ ॥  
 অবনীর্ উপকার, করুণ করুণ ।  
 গ্রীষ্মনাশে রণ অস্ত্র ধরুণ ধরুণ ॥

মেঘনাদে হয়ে যাক্, ধরা টল টল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ।  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ।



কোথায় করুণাময়, জগতের পতি ।  
 তব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥  
 করুণা-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার ।  
 পড়ুক আকাশ হোতে, সুধার সুধার ॥  
 চেয়ে দেখে চরাচরে, কারো নাহি বল ।  
 কিরূপ হৈয়োছে সব, অচল সচল ॥  
 আর নাহি সহ হয়, প্রভাকর-কর ।  
 মারা যায় তব দাস, প্রভাকর-কর ॥  
 কাতরে তোমায় ডাকি, অঁাখি ছল ছল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥  
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ।  
 দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥



## বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদূর্ভাব ।

প্রতিদিন পোড়া জল, হর হর হয়না ।  
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, সৃষ্টি আর নয়না ॥  
যাই যাই বিনা কেহ, কোনো কথা নয়না ।  
উহ উহ বাপ বাপ, তাপ আর নয়না ॥  
বরুণ করুণ হোয়ে, কৃপাভাব নয়না ।  
জলধর চাতকের, তহু আর নয়না ॥  
সধবা বিধবা সাজে, ফেলে দিয়ে নয়না ।  
গ্রীষ্মে হোলো তপস্বিনী, যত সব নয়না ॥

মিছেমিছি করি জাঁক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,  
মিছে ডাক, শরদের প্রায় ।  
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,  
চলেনা দৃষ্টির গতি হায় ॥  
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গানের মাস,  
রসকস কিছু নাহি মুখে ।  
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়,  
বরষা বরষা মারে বুকে ॥

বরষার একি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,

ভাল ধারা ধরে ধারাধর ।

করিতেছে সমীক্ষণ, হতাশন বরিষণ,

পুড়ে যায় ধরা ধরাধর ॥

মরে যত জলচর, নদনদী সরোবর,

শুখাইল যত জলাশয় ।

হার একি অপকৃপ, অনলে পুরিল কৃপ,

পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥

ধ্যান করি জলদেরে, জলদেরে জলদেরে,

হাজল বোজল শুধু কয় ।

হোয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,

মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥

ফুটফাটা হোলোঁ ঘাট, চেলাকাট যেন মাঠ,

হাট বাট সকল সমান ।

শমম-তাতেতর তাতে, একেবারে সব তাতে,

তাতে আর নাহি রয় প্রাণ ॥

বরষার খেল্লে হলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,

দশদিক করে অন্ধকার ।

ঘর দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,

এ প্রকার সাধ্য আছে কার ?

কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,

ক্ষীণ হীন মলিন সবাই ।

বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,  
কোনোরূপে রক্ষা আর নাই ॥

এতাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপি পাতাল জুড়ে,  
বাসুকীর মাথা পুড়ে যায় ।

উপরে পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,  
মরি মরি হার একি দার ।

দিনকর খরতর, অমরেরা মর মর,  
জর জর হলো ত্রিভুবন ।

বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হরে বিশ্বের আয়ু,  
জীবনদ না দেয় জীবন ॥

ভূমে শস্য, ফল গাচে, আহারে জীবন বাঁচে,  
জলেরে জীবন সবে কর ।

বল বল গুনি তাই, এ জীবন বিনা তাই,  
জীরের জীবন কিসে রয় ?

যথা যথা শাখী যত, গুথাতেছে অবিরত,  
শাখাপত্র সব হোলো সারা ।

ঘোর তৃষ্ণা সোয়ে সোয়ে, ক্রমেতে নীরস হোয়ে,  
সমুচর চারা গেল যারা ॥

তাপেতে গুথায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,  
ফুলবাসে বহি করে বাসা ।

সৌরভে গৌরব নাট, আয়োদ নাহিক পাই,  
ভ্রাণ নিলে জ্বালে যায় নাসা ॥

কি কব ছুঃখের কথা, বৃক্ষসহ যত লতা,  
সখ্যভাবে ছিল এতদিন ।

মুখতুলে সেই লতা, এখন না কর কথা,  
নতমুখে হতেছে মলিন ॥

বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি,  
লতার শুবকরূপ স্তন ।

নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভোগ,  
কোরেছিল প্রেম আলাপন ॥

দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী,  
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায় ।

দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন,  
ক্রতগতি উর্দ্ধমুখে ধার ॥

মরি মরি আঁহা আঁহা, এখনি দেখেছি যাহা,  
ক্লণপরে তাহা নাই আর ।

পতির অবস্থা ভেদে, সতী লতা মরে খেদে,  
কালের কি ভাব চমৎকার ॥

কালের কি ধর্ম হেন, আঘাতে বৈশাখ যেন,  
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে ।

জ্বালে পুড়ে ছারখার, ধরনী কি বাঁচে আর,  
যর্ম্ম আর নরনের জলে ।

নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর,  
হোরে গেল দারুণ হৃদয় ।



নরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাচিতে পারে,  
কোথা তবে সুখের ভরসা ?  
কার কাছে করি খেদ, ~~কি~~ তবে ঘটেছে ভেদ,  
লুপ্ত হইবে বেদ-ব্যবহার ।

স্বভাব অস্বভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ করে,  
নিদাঘ সাম্প্রতিক দুর্গাচার ॥

পুকুরের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলৈ রাজা,  
পেটে পূরে জলের সাগর ।

চক্ চক্ গেলে যত, উদরী রোগের মত,  
সকলেরি উদর ডাগর ॥

পাত্তে মাত্র দিই হাত, কে খায় গরম ভাত,  
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল ।

কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তাই,  
টম্বল টম্বল চামি জল ॥

উহ্ উহ্ রাম রাম, পচিয়া গানের চাম,  
ঘামকুঁড়ে ঘামাচি নির্গত ।

সাদ, কণ্ডু সব গায় নাটুরে মাজির প্রায়,  
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত ॥

সুজাচার বারা শুচি, কালভেদে হাড়ীমুচি,  
আচার হইল রাখা দায় ।

খেতে বোসে চুৰকুমি, মেগিরা নখের কুমি,  
এঁটো হাত দিতে হইল গায় ॥

পূজা, সন্ধ্যা নাহি ঘাটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,  
ফেলে দিয়ে ফুল বিশ্বদল ।

ঠাকুরে ঠেকায়ে ~~কাল~~, বিস্তার করিয়া গলা,  
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল ॥

সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,  
তপ্তভাতে তপ্ত না হইয়া ।

বলে বাসি, ভালবাসি, নেবু রস গন্ধ বাসি,  
পাস্তা খান আমানী মাথিয়া ॥

কারো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,  
রাজভোগে নহে গ্রাস রত ।

দেহ হোতে করে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,  
ঘোল নিয়ে গোল করে কত ॥

হোয়ে ভীষ্ম গ্রীষ্মরাজ, সাধিছে আপন কাজ,  
ঘোরতর করিছে নাকাল ।

ছোট বড় আদি মত, আহারে উড়ের মত,  
খেতেছেন সবাই পাকাল ।

ঘাহারা সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়,  
পরে আর কে করে আহার ।

কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, অকাশে অগ্নির খেলা,  
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার ॥

পশ্চিমের মত খোটা, নাহি খায় চানা ভোটা  
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ।

লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিরায় গীত গেয়ে,  
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত ॥

উড়ে বলে হোরে ভাই, গেলো কাঁই পাই,  
\* \* \* গেঁইাড়ি-পো শলা ।

লুগাপট্টা নেরে নেরে, ঠাঙা জড় আনি দেরে,  
খরারে মো ইঁসা উড়ি গলা ॥

দিশি পাতিনেড়ে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা,  
মলাম মলাম নামু কয় ।

ইঁাডুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,  
নাতি তবু নিদ নাহি হয় ॥

এঁদে দেয় ফুফু, নানী, কলুই ডেলের পানি,  
ক্যাচাক্যালা কেচুর ছালন ।

বাগুণ ফলেনি গাচে, বালবাচ্চা কিসে বাঁচে,  
কিনে খাতে তেকার মরণ ॥

আসমানে পানি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাখে ভাই,  
বরাক্রমে পুচ কর গিয়া ।

খোদা তালো নাজা করে, চেনি খাই প্যাটতরে,  
মোট বই ঞাপ বিচাইয়া ॥

আনি দে \* \* \* বাই, হীতল হলিল খাই,  
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে ।

তাহা চামু তাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু,  
বগবতী বৈরব কোহানে ?



নিরন্তর খায় সোদা, জেঁদা মুখে লাগে বোদা,  
বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥

কেরানী আমলা আর, জারের সরকার,  
ষত যত ব্যবসায়ীগণ ।

এক দশা সবাকার, শরীর বহেনা আর,  
নিজ নিজ কর্মে নাহি মন ।

পড়ুরার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট,  
ভিখারী না ভিক্ষা নিতে যায় ।

পথিকেরা গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন,  
পোড়ে থাকে যথায় তথায় ॥

গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ,  
উড়ে যায় তুণের কুটীর ।

তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন,  
জপে তপে মন নহে স্থির ॥

বাহা হোতে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম তার,  
কিসে তবে হইবে নিস্তার ?

সমীরণে হতাশন, হতাশনে সমীরণ,  
জলে করে অনল বিহার ॥

কাননের পশুগণ, এতদূর আলাতন,  
সমভাবে শান্তিগুণ ধরে ।

যে যাহার হয় লক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,  
পরস্পর হিংসা নাহি করে ॥

কিছুমাত্র নাহি রাগ,                      বিবর ছাড়িয়া বাধ,

জর জর হোয়ে পোড়ে আছে ।

গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ                      থপ থপ নেড়ে ঠ্যাং,

ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে ॥

টুকে গৃহস্থের পুরি,                      চোরে নাহি করে চুরি,

অলসে অবস তার দেহ ।

বড় বীর বোকা বত,                      হোয়ে বলবুদ্ধিহত,

সমরে সাজেনা আর কেহ ॥

শাখীপরে পাখী সব,                      অবিরত করব,

আহার বিহার নাহি করে ।

নীড় মাঝে ভিড় নাই,                      যে কিছু গুণিতে পাই,

বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে ॥

গেল বছরের আশা,                      গালে হাত দিয়ে চাষা,

বোসে আছে কাছে রেখে তল ।

বরষার নাহি ধারা,                      ধান্ধাচারি গেল মারা,

হুই চক্ষে শতধারা জল ॥

মিছেমিছি জেকে জুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে,

ফোঁটা কত হয় বরিষণ ।

বসুধার ষোর তুষা,                      সে জলে কি হয় কুশা,

আরো তিনি হন জালাতন ॥

দিবামান নিশামান,                      হান ফান করে প্রাণ,

পরিপ্রাণ নাহি জল বিনা ।



আর এক ভিক্ষা চাই,      দয়া কোরে দিলে তাই,  
    কিছুই তো চাহিব না আর ।  
 অহঙ্কার ঘোর ভীষ,      মানবের মনে গ্রীষ,  
    শান্তিজলে করহ সংহার ॥  
 এই শান্তি জল দিয়া,      দেখাও কৃপার ক্রিয়া  
    বিদ্রোহ অনল করি নাশ ।  
 বিপদ বিনাশ হোক,      রাজা প্রজা মুখে বোক  
    এই মাত্র মনে অভিলাষ ॥



## বর্ষার বিক্রম বিস্তার ।

ধরাধামে স্বভাবের, ভাব বিপরীত ।  
 বরষার ঘোর যুদ্ধ, গ্রীষ্মের সহিত ॥  
 নিশাধারে জলধার, গ্রীষ্ম বধিবারে ।  
 করিলেন বারি বৃষ্টি, মুষলের ধারে ॥  
 ঘর দ্বার পথ ঘাট, মহা সিন্ধুময় ।  
 নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয় ॥



গৃহস্থের কাঁরাহাটী, রান্নাবরে এসে ।  
 হাসিয়া ভাতের হাঁড়ী, জলে যায় ভেসে ॥  
 জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে ।  
 কলের জাহাজ যেন, গাড়ী সব চলে ॥  
 বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়া ভালা ।  
 কিলি কিলি মীন যত, পথে করে খালা ॥  
 পথিকের দশা দেখে, নেত্রে জল ঝরে ।  
 উঠিছে পায়ের জুতা, মাথার উপরে ।  
 বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমৎকার ।  
 চলিতে চরণ বাধে, বস্ত্র রাখা ভার ॥  
 ক্ষেত্রের নির্মল শোভা, দেখে পূর্ণ আশা ।  
 গেল ধবন্ধ, মহানন্দ, চাষ করে চাষা ॥  
 রসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ ।  
 স্মৃথে কহে কর সার, বরষার পদ ॥  
 প্রেমরসে সত্ত্ব দৌছে, প্রেমানন্দ ঘোরে ।  
 হায় রে বরষা ঋতু, বলিহারি তোরে ॥

---

## বর্ষার ধুমধাম ।

নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে ।  
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে ॥  
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে ।  
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্, হুহুকার ছুটে ॥  
সুমধুর কত সুর, ভেঁকে গীত গান্ন ।  
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায় ॥  
কড়্ কড়্ মড়্ মড়্, রাগে রাগ বাড়ে ।  
হড়্ মড়্ কড়্ মড়্, টিটকারী ছাড়ে ॥  
ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে ।  
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্, নহবৎ বাজে ॥  
থরথর দিনকর, লুকাইল তাপে ।  
থর থর গর গর, ত্রিভুবন কাঁপে ॥  
হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্, ঘন ঘন হাঁকে ।  
ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে ॥





ভরুণ পল্লবমানে,                      দেখা যায় ডালে ডালে,  
কদম্ব-কলিকা বিকসিত ।

মধুমক্ষি মস্ত হয়ে,                      সঙ্গেতে স্বদল লয়ে,  
পান করে অমৃত অমিত ॥

হেরি তার মস্ত ভাব,                      মনে ভাব আবির্ভাব,  
ভয় হয় কবিতা রচনে ।

গুপ্তভাবে গুপ্তভাব,                      রাখিলে কি হবে লাভ,  
গুরু ভয় গুরু কুবচনে ॥

অতএব ব্যক্ত করি,                      মধুমক্ষি মধু হরি,  
মস্ত হয় বরষা-কুপায় ।

মল্লিকা মুকুতা ভাতি,                      মধুকর মদে মাতি,  
গুঞ্জরিয়া ভুঞ্জে মধু তায় ॥

আর এই দেখ সদা,                      খাইয়া মেঘের মদ্য,  
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা ।

নবীনা ষোড়শী প্রায়,                      অপরূপ শোভা পায়,  
রসিক ভাবুক-মনোহরা ॥

রসপানে ভরুলতা,                      প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,  
মাদকতা গুণে বলিহারি ।

যত সব নদী নদ,                      খাইতে তুষার মদ,  
হইয়াছে শেখরবিহারী ॥

রসে হয়ে গদ গদ,                      পাইয়া পরম পদ,  
সাগরেতে করিছে পয়ান ।

তথা সিন্ধু স্মৃথী হয়ে,                      তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে,  
অবিরত করিতেছে পান ॥

ত্রিলোক-তিমিরহর,                      নাম যার দিবাকর,  
সেই সূর্য্য মদে মাতালা ।

ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি,                      প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,  
শুষ্কিছেন সংসার-পেয়ালা ॥

অতএব বুদ্ধগণ,                      আগাদের নিবেদন,  
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ ।

দেখিতেছি চরাচরে,                      সকলেই পান করে,  
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোর ॥

বহু বহু সমীরণ,                      বরিষ বারিদগণ,  
চমক হে চপলার মালা ।

সহাস্য-রহস্য মুখে,                      পান করি মনোহুখে,  
জুড়াইব অন্তরের জালা ॥

## বর্ষার আবির্ভাব ।

ছুটিল পূবের বায়ু,                      টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,  
ফুটিল কদম্বকলিগণ ।

বরিষে জলদ জল,                      হরিষে ভেকের দল,  
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ ॥

শুক্ল বয়স কালে,                      অরুণ জলদজালে,  
 \* বরুণ সহিত করে রণ ।

প্রভাতে সমর রঙ্গ,                      প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,  
 শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ ॥

মলিন দিবসকান্ত,                      মলিন বিরস কান্ত,  
 অলীন ভ্রমর তার কোলে ।

\*           \*           \*           \*

\*           \*

নিবিড় নীরদকলা,                      কি শোভা না যায় বলা,  
 অমলা কালিন্দী রঙ্গময় ।

মনে মনে এই গণি,                      গ্রাসিবারে দিনমণি,  
 ওই কালনাগিনী উদয় ॥

বরষার ঘোর ঝিষে,                      নীরদ ভুজঙ্গু বিষে,  
 ভানুকর নিকর নিঃকর ।

ভস্ম আচ্ছাদিত যেন,                      প্রজ্বল অনল হেন,  
 আজু প্রভাতের দিনকর ॥

অতঃপর ঘোরতর,                      নীরধর আড়ম্বর,  
 শূন্যপর করে অতিশয় ।

চাকু চাকু সমুদিত,                      গুরু গুরু গরজিত,  
 ছুরু ছুরু কম্পিত হৃদয় ॥

বহিতেছে সমীরণ,                      করিতেছে ঘোর রণ,  
 নিদাঘ বরষা সহকার ।

সন্ সন্ স্বরে গাজে,                      ঝন্ ঝন্ মাজে মাজে,  
 শব্দ করে শুরু ত্রিসংসার ॥  
 চক্‌মক্‌ চিকি মিকি,                      ধক্‌ ধক্‌ ধিকি ধিকি,  
 সূচক্‌লা চপলার মালা ।  
 ঝম্‌ ঝম্‌ হয় জল,                      ধরাতল সূশীতল,  
 ঘুচে গেল সস্তাপের জ্বালা ॥  
 একবারে পড়ে ধারা,                      কিবা শোভা পায় তারা,  
 তারা যেন পড়িছে খসিয়া ।  
 পুলকে চাতকদল,                      পান করে ধারা-জল,  
 গান করে রসিয়া রসিয়া ॥



## বর্ষার অভিষেক ।

নীরদ দ্বিরদবর,                      আরোহিয়া তহুপর,  
 ঋতুবর বরষার জাঁক ।  
 গুড়ু গুড়ু গুম্‌ গুম্‌,                      গুড়ু ম গুড়ু ম গুম্‌,  
 বাজিতেছে রণ-জয়টাক ॥  
 ওই করে ফর্‌ ফর্‌,                      গতি অতি খরতর,  
 দামিনীর উড়িছে পতাকা ।  
 প্রজারূপে তরুচয়.                      প্রণত হইয়া রয়,  
 দিয়া কর ফল পাকা পাকা ॥



যদি কেহ তুষ্ট হয়,                      নিদাঘের পক্ষে রয়,  
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা ।

সাঁজোয়াল সমীরণ,                      কাণ ধরি সেইক্ষণ,  
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা ॥

মণ্ডল কাঁটাল ভায়া,                      পেয়েছেন বড় পায়া,  
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত ।

কলের পিহ্বা বুড়া,                      শালা রসিকের চূড়া,  
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত ॥

কুলের কামিনী ধনী,                      চাতকিনী সুখ গনি,  
হলুধ্বনি করে অবিরত ।

জলাশয়ে হংসীগণ,                      জলে দিয়া মস্তুরণ,  
কলরবে কেলি করে কত ॥

পূর্ণ হলো মনোমাধ,                      করিতেছে ভেরিনাদ,  
ভীষণ ভয়াল হবে ভেক ।

আষাঢ়ের সুসঞ্চারে,                      শুভ শশধর বাড়ে,  
হইল বর্ষার অভিষেক ॥

—\*—

## বর্ষায় লোকের অবস্থা ।

রাশ্মাঘরে কান্নাহাটী,                      ভিজ়ে কাট ভিজ়ে মালী,  
মোনমতে নাহি জলে চুলো ।

নাকে চোকে জল সরে,                      সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,  
চুলোশুক্কে চোলে যায় চুলো ॥

ধনির স্রুথের ধ্বনি,                      ,নিয়ত নিকটে ধনী,

নাহি মাত্র মনের বিকার ।

ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,

মনোমত আহার বিহার ॥

স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি,              স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি,

পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার ।

সদা তায় সদাচার,                      আচারে কি কদাচার,

লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥

দীন তাহা কোথা পান,                      সূধুমাত্র জলপান,

তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে ।

টাকা বিনে হতবুদ্ধি,                      কিসে বল হবে শুদ্ধি,

ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে ॥

বিদেশী ধর্মের ষাঁড়,                      ভরসা কেবল তাঁড়,

ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্গে ।

বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী,                      ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,

চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে ।

যত সব বিলসাধা,                      সকল শরীরে কাদা,

জামা পাগ ভিজিল উদকে ।

বহুকালে ছেঁড়া জুতা,                      পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,

একেবারে উঠিল মস্তকে ॥

আমরা টোলের ছাত্র,                      নাহি জানি পাত্রাপাত্র,

জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ ।

বাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচ তেল লুণ,  
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥

মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,  
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে ।

তিন মাস রুদ্ধপাঠ, কিরে হাট ঘাট মাঠ,  
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥

আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,  
আদসিক্ত তাই হয় পাক ।

পৈত্রিক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা,  
তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥

তুই সন্ধ্যা তাই খাঁই, মাঝে মাঝে গীত গাই,  
ধোবা বেটা বটায় প্রমাদ ।

রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে.  
মিত্রজরে করি আশীর্বাদ ॥

বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,  
বারিবাক্যে চরাচর ভাসে ।

কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যঙ্গ.  
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে ॥

আমরা বিপ্রেয় পুত্র, ধরিয়াছি বজ্রসূত্র,  
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা ।

জাতিধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,  
চাল ভেসে পড়ে ঘর চাপা ॥

# বর্ষার ঝড়বৃষ্টি ।

মালঝাঁপ ছন্দ ।

ঘটা ঘোর, করে শোর, ঘন ঘোর, রবে  
শুনি চিত্ত, চমকিত, বিচলিত, সবে ॥  
ঝন্ ঝন্, ফণ্ ফণ, সন্ সন্, ঝড়ে ।  
তরুচয়, স্থির নয়, বোধ হয়, পড়ে ॥  
বিজলীর, কি মিহির, যেন তীর, ছোটে ।  
ঝড় ছাট, ভাঙে হাট, মালসাট, চোটে ॥  
বহে বাত, ছাঁত ছাঁত, শিলাপাত, সঙ্গে  
বোধ হয়, করে লয়, সমুদয়, বঙ্গে ॥  
করে রব, কলরব, ধরে সব, রঙ্গে ।  
নদী নদ, পেয়ে পদ, গদ গদ, অঙ্গে ॥  
হেউ হেউ, করে চেউ, যেন ফেউ, ডাকে ।  
অবিকল, কল কল, ঘোর জল, পাকে ॥  
তুহুপরি, যত তরী, নৃত্য করি, যায় ।  
শ্রেমিকের, হৃদয়ের, আশয়ের, প্রায় ॥  
রাজহাঁস, কি উল্লাস, অভিনাষ, পুরে ।  
অহরহ, যত দহ, হংসী সহ, বুরে ॥











মনে আছে প্রেম আটা, মাথিয়া বেলের আটা,  
জুড়ে দেয় সোনালি রুপালি ॥

সবে বলে সাজা সাজা, জানেনা শেষের মজা,  
সঙ সেজে কত রঙ করে ।

কি বাজনা বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ,  
চুকিয়া সংসার-সাজঘরে ?

আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই,  
তুমি কর কার চক্ষুদান ?

আপনি না হোয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী,  
নিজ করে করিয়া নির্মাণ ?

ধর ধর তুলি ধর, কর কর পূজা কর,  
হর হর বল জীবচয় ।

গোড়ে পূজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব,  
মনে যদি স্থির প্রেম রয় ॥

কামনা কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এঁটে,  
গল্পফেঁদে কল্প করা দোষ ।

ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোষ মহারত্নে,  
পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥

যাজক ব্রাহ্মণ বারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা,  
খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা ।

বজমান বড় আঁট, পক্ষবৃতি চণ্ডীপাঠ,  
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা ।

নবমীতে করি কল্প,                      ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প,  
গাল গল্প প্রতি ঘরে ঘরে ।

কারিগুরি করি নানা,                      সাজায় বৈঠকখানা,  
ঘর দ্বার পরিষ্কার করে ॥

প্রকৃতির সাজ যাহা,                      বিকৃতি না হয় তাহা,  
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন ।

তুমি কর যত রূপ,                      কতরূপ তার রূপ,  
অপরূপ বিরূপ রচন ॥

মনোহর ঘর দ্বার,                      মেরামতি কত তার,  
রঙিন্ করিছ ঠাই ঠাই ।

কিন্তু তব বাস ঘর,                      নাম যার কলেবর,  
তার আর মেরামত নাই ॥

যেই ধনী ভাগ্যধর,                      আছে অর্থ বহুতর,  
অনায়াসে ব্যয় করে ধন ।

দান কার্যে সদা রত,                      এখন সম্পদহত,  
দুর্গা তার দুর্গের কারণ ॥

পোড়ে ঘোরতর দুর্গে,                      ডাকে সদা দুর্গে দুর্গে,  
ভাগ্যে তার নাহি শুভ ফল ।

নাহি আর ধুমধাম,                      অবিশ্রাম অষ্ট যাম,  
কেবল নয়নে ঝরে জল ॥

বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ,                      লোভেতে চঞ্চল মন,  
স্নান পূজা কিছু নাই আর ।





পূর্বে প্রায় মাসাবধি,                      না খায় অশ্বল দধি,  
বিশেষতঃ যত কাঁশীদার ॥

কেমনে হইবে জিত,                      চুপি চুপি শেখে গীত,  
ভাব তার না হয় প্রচার ।

চিতেন মহড়া বেঁধে,                      উচ্চ সুরে গলা সেধে,  
গান ধরে “ভবে কর পার” ॥

যতেক সখের দল,                      প্রেমানন্দে ঢলাঢল,  
সুর ভাল লাগিয়াছে কাণে ।

কোন অংশে নহে কম,                      মারিয়া গাঁজায় দম,  
তান ছাড়ে “দেওয়ার গানে” ॥

ষাত্রাকরে করে ষাত্রা,                      কে বুঝে তাহার মাত্রা.  
প্রথমে মহালা করে দান ।

সাজেগোজে সুর জুতি,                      কেহ বলে ওগো দূতি,  
“কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে প্রাণ ॥”

যার ষাহা ভাল লাগে,                      সেই তাহা রাখে আগে,  
পণ করি দেয় তার পণ ।

কেহ রাখে বেলতলা,                      মালিনীর ভাল গলা,  
গুণে তার খুন করে মন ॥

ষাত্রার ষমক ভারি,                      নামজাদা অধিকারী,  
আসর করিছে অধিকার ।

দালানে বাবুর মেলা,                      প্রতি পদে দেয় পেলা,  
সাবাস্ সাবাস্ বার বার ॥

আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা,

হেলা কেন করিতেছ কাজে ?

ভবযাত্রা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে,

অশ্রু সাজ তোমায় কি সাজে ?

এ নাটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী,

তঁার প্রতি কেন কর হেলা ?

মান রেখে তান্ ধর, ফুরালে মানের ঘর,

কবে আর পাবে বল পেলা ?

দেহ যাত্রা তুমি যাত্রী, অবসান হয় রাত্রি,

হবে যাত্রা কাটি দিলে ঢাকে ।

কর যাত্রা, দেহ-যাত্রা, কিন্তু হয় শেষ যাত্রা,

গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে ॥

স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল সুরের লক্ষ্য,

রজনীতে গানবাদ্যছটা ।

ঝাঁকে ঝাঁকে আসে লোক, বিষম মনের ঝাঁক,

কি কহিব আয়োদের ঘট ।

বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুয়া নাচায় বাই,

মনোগত রাগ সুর ধোরে ।

মুহু তান ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান,

বাবুদেব লবেজান কোরে ॥

গুণি-হস্তে তানপুরা, তাহে কত তান্ পূবা,

মেও মেও ছাড়ে তার তার ।

কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অমুরাগ,

রাগ নর রাগমাত্র সার ॥

সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত,

সেতার বেতার কার লাগে ?

পিড়িৎ পিড়িৎ রারা রারা, সারিগামা ডারা ডারা,

মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥

ভাধিনা ভাধিনা ধিনা, কত রাগে বাজে বীণা,

বীণা বিনা কিছু নহে ভালো ।

শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর,

মনে জলে আনন্দের আলো ॥

সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল,

পড়েছে চলির ঢোলে কাটি ।

ভাধিন ভাধিন রব, শুনিয়া মাতিল সব,

চাটি শুনে কেটে যায় মাটি ॥

নবতের বড় ধুম, গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্,

ভেঁা ভেঁা ভেঁা ভেঁা বাজিছে সানাই ।

মন্দিরে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,

তালে তালে তাল ধরে তাই ॥

এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,

ভাগসিকে ধনী ছাড়ে চাকি ।

পূজার না লন খোঁজ, নাছি কাঁদে তিনরোজ,

পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা,      বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,  
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন ।

সুসার হইলে তার,      শেষে পুত্র বস্ত্র পায়,  
আপনার জন্তে দুঃখী নন ॥

দাতার গাহিয়া জয়,      ভট্টাচার্য্য মহাশয়,  
নশু ছলে মিসি লন কিনে ।

পুঁতির ভিতরে ভরি,      শ্রীহরি স্মরণ করি,  
বাড়ী চোলে যান দিনে দিনে ॥

প্রায় বৎসরের পরে,      প্রবাসিরা যান ঘরে,  
কত সাধ মনে অগণন ।

হয়ে প্রেম-অনুরাগী,      করেন প্রিয়ার লাগি,  
নামামত দ্রব্য আয়োজন ॥

কেহ লয় সাতনলী,      দেখিয়া আমরা বলি,  
কামকিরাতের সাতনলা ।

প্রকাশিতে নিজ মেহ,      বিজটা লইল কেহ,  
কেহ বা লইল কানবালা ॥

কেহ লয় কর্ণফুল,      কেহ বা কনক-দুল,  
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার ।

কেহ বা মুকুতা-মালা,      কেহ বা কাঞ্চন-বালা,  
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥

ভূষণ লইল যত,      বসন তাহার যত,  
মনোমত লইল সবাই ।



কেহ নয় শান্তিপুরে,      কেহ বা বাগড়ি ডুরে,  
কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥

বড় ধুম বড় ঘরে,      সাটিনে কাঁচুলি করে,  
চুমকির কাজ তার মাঝে ।

\* \* \* \* \*

হেরি শশী শশধরে লাজে ॥

সকল শরীরে ভূষা,      মূর্ত্তিমতী যেন উষা,  
পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ ।

বর্ণনে অক্ষয় কবি,      মলিন শশাঙ্কচ্ছবি,  
রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥

আকুলিত চারু কেশে,      সেই ভূষা সেই বেশে,  
ভুজপাশে বাঁধে যার কর ।

কোথা আর স্বর্গবাস,      তাহার দাসের দাস,  
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর ॥

তেমন কপাল নয়,      মনে মাত্র সাধ হয়,  
রূপখানি দেখে মরে যাই ॥

বায়না অগ্রেতে দিয়া,      আয়না লইল গিয়া,  
বায়না তাহার শোভা বলা ।

লইল গোলাপি মিসি,      ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,  
আর কত পানের মসলা ॥

ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি,      লইলেক রাশি রাশি,  
যাহে ভাল বাসিবেক প্রিয়া ।

নিল মালা কত মত,            কামিনীর মনোমত  
           হার হারে যাহারে হেরিয়া ॥  
 জানাইতে ভালবাসা,            চুঁচুড়ার মাতাঘষা,  
           কমা কিন্না রমা কেবা গণে ।  
 কিনিল পরমাদরে,            দিয়া কামিনীর করে,  
           কৃতার্থ হইব ভাবে মনে ॥  
 অন্তরেতে ভয় আছে.            পছন্দ না হয় পাছে,  
           এই হেতু স্তম্ভ নহে মন ।  
 করিয়া বিশেষ ভক্তি,            লইলেন যথাশক্তি,  
           স্বীয় শক্তি পূজার কারণ ॥  
 পাড়াগেঁয়ে যুবাদল,            মুখে হাস্য খল খল,  
           পরিচ্ছদে সদা মন কাবু ।  
 মনে মনে বড় সাধ,            ফাঁদিয়া মোহন ফাঁদ,  
           দেশে গিয়া সাজিবেন বাবু ॥  
 কালাপেড়ে ধুতি পরা,            দাঁতে মিসি গালভরা,  
           ঠোঁট রান্ধা তাম্বুলের জলে ।  
 গোড়গাবি জুতা পায়,            রঙ্গিন ত্রেজাই গায়,  
           হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে ॥  
 যাহার সঙ্গতি যত,            বস্ত্র লয়ে সেই মত,  
           দূর করে মনের বিলাপ ।  
 ইয়ারের অনুরাগে,            চরম লইল আগে,  
           আর কিছু আতর গোলাপ ॥

সহরের লোক যত,                      তাদের উল্লাস কত,  
 সুখের আমোদে সদা রত ।  
 বাবু সবে ঘোর গর্জি,              বাড়ীতে আনিয়া দর্জি,  
 পোসাক করিছে কত মত ॥  
 কারপেট ঢাকে সেট,              কারপেট্ কারপেট্,  
 কারুকর্ম তাহে বাছা বাছা ।  
 স্বভাবের শোভা সব,              তার কাছে পরাভব,  
 কৃত্রিম হরেছে যেন সাঁচা ॥  
 বান্ধবের গড়াগড়ি,              তিনদিন ছড়া ছড়ি,  
 লেবেগুর গোলাপ আতর ।  
 আর আর দ্রব্য বাহা,              ফুটে না লিখিব তাহা,  
 ব্যয়কল্পে না হন কাতর ॥  
 বিরহিণী নারী যারা,              নিয়ত নয়নে ধারা,  
 তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে ।  
 কিসে মন হবে শান্ত,              কতক্ষণে পাবে কান্ত,  
 বিচ্ছেদ অনলে মন জলে ॥  
 হইবে পতির সুরা,              মানে কত পান গুরা,  
 করিবেক প্রেমের অধীন ।  
 সুখের আশ্বিন মাসে,              প্রবাসী আসিবে বাসে,  
 সুবচনী দিবেন সুদিন ॥  
 বিদেশী কলমপেবা,              সকলের এক নেশা,  
 পরম্পর কর এই কথা ।

চাকুরীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই,  
 নিবাসে রমণী-মণি যথা ॥  
 পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,  
 কোন রূপে ধৈর্য নাহি মানে ।  
 সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন পাখী,  
 প্রেমসীর প্রণয়-বাগানে ॥  
 ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,  
 কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে ।  
 গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা,  
 মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥  
 ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,  
 দূরে দেহ শয়নে স্বপনে ।  
 নাহি সুখ একটুক, ঘোর দুখ ফাটে বুক,  
 টানমুখ সদা পড়ে মনে ॥  
 মনিবে না দেয় ছুটি, দিবানিশি ছুটাছুটি,  
 কুটি গিয়া ছট ফট করে ।  
 নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,  
 জমা লেখে খরচের ঘরে ॥  
 ছুটি লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্নি করি ভাড়া,  
 বসে গিয়া নাবিকের কাছে ।  
 হুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,  
 মাঝি আর কত দূর আছে ?

কোসে দাঁড় টান দাঁড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি,

চাল তরি তরায় করিয়া ।

যত শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্‌সিস পাবে,

ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া ॥

বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাজি,

ঠেলে ধজি গায়ে যত জোর ।

গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,

টানাটানি যেন কত চোর ॥

লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ঘুম,

'খোসে গেল মনের কপাট ।

বাড়াদূর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,

ওই দেখ দেখা যায় ঘাট ॥

থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভূর,

চালের উপরে গিয়া চড়ে ।

ধর ধর কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়,

ইচ্ছা হয় কাঁপ দিয়া পড়ে ॥

যায় উজানের যান, যায় উজানের যান,

মুখ নাড়ে অজগর প্রায় ।

ভাটি যেন ছোট্টে কল, কল কল কাটে জল,

আরোহিরা চন্দ্র হাতে পায় ॥

গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,

দাঁড়ে হয় শব্দ রূপ রূপ ।

নিজাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরি,  
না মানে শিশির আর ধূপ ॥

জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্যুগণে,  
নিজ নিজ ব্যবসার রত ।

কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে,  
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত ॥

রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা নাটে,  
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি ।

ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস-পবন-ভরে,  
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥

বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,  
তাড়াতাড়ি রাঁদি গিয়া সোই ।

চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল,  
ফলনা আইল বুঝি ওই ॥

হোলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা আঁচি,  
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী ।

প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই,  
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥

হেসে বলে কোন বুড়ী, মর মর ওলো ছুঁড়ী,  
ওয়ে বুড়ো আর কার পাপ ।

কেহ কহে দূর দূর, ওবাড়ীর বট্ঠাকুর,  
কেহ কহে অমুকের বাপ ॥

আর জন বলে' মই,      আমাদের কর্তা ওই,  
                          চিনিরাছি শরীরের চাচে ।  
 গায়ে সব লোম উঠা,      চোক কটা পেট মোটা,  
                          সেইরূপ গালে দাগ আছে ॥  
 কেহ কয় ওলো'ওলো,      আই আই মোলো মোলো,  
                          চোক খেয়ে কর দরশন ।  
 রূপখানি চল চল,      প্রাণধন কারে বল,  
                          ওষে দেখি দাদার মতন ॥  
 যুবতী কুলের বধু,      প্রফুল্ল কুলের মধু,  
                          মনে মনে কত শোক উঠে ।  
 ডুব ছলে করে দৃষ্টি,      মদনের বাণ বৃষ্টি,  
                          ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥  
 ঘোমটার আড়ে আড়ে,      সঁষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,  
                          বিরহ-বিলাপ বাড়ে তার ।  
 যুবক পুরুষ যত,      চলিয়াছে শত শত,  
                          নিজ পতি দেখিতে না পায় ॥  
 তরুণী আইলে কাছে,      তরুণী মনেতে আঁচে,  
                          পাইব আপন প্রাণধনে ।  
 খাণ্ডী ননদ কাছে,      লজ্জাভয় ফেরে পাছে,  
                          মনের আগুন রাখে মনে ॥  
 কুলের কামিনী মনি,      এত কেন ভাব ধনি,  
                          প্রাণপতি আসিবেক ঘরে ।

তোমার খাণ্ডী গিন্নি, মেনেছে পীরের সিন্ধি,

সস্তানের আসিবার তরে ॥

সুর তরঙ্গিনী জলে, \* \* \* \* \* দলে,

পরস্পরে বলে সমাচার ।

ঘরে রেখে ছেলে পুলে, কর্তাটা' রহিল ভুলে,

আসিবার নাম নাই আর ॥

বত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,

দেখে শুনে কাঁদে সব তারা ।

ভেবে ভেবে তনু কালী, রাগে দিই গালাগালি,

ধার করে কত হব সারা ।

কেহ বলে অতি গাঢ়া, তোমার চাটুঘ্যা দাদা,

ঘরে থেকে করে খিটিমিটি ।

প্রবাসে বাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,

এক মাস লেখে নাই চিটি ॥

সেজোবোরু কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,

কোন মতে যেতে নাহি পারি ।

বছরের শুভ দিন, দুঃখে হন্ন দেহ ক্ষীণ,

বিধাতা করিল কেন নারী ॥

কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,

মরি কিবা সোনার সংসার ।

অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী,

জিনিস এনেছে ভারে ভার ॥



জুগি জোনা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী,  
তাড়াতাড়ী চলে মনোরথে।

টাকা ছেড়ে খাবড়ায়, পার হয়ে হাবড়ায়,  
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥

হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,  
কলে চলে স্থলে জলে সুখ।

বাড়ী নহে বাড়াদুর, অবিলম্বে পায় পুর,  
হয় দূর সমুদয় দুখ ॥

ভাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,  
যাদের নিবাস দূর দেশে।

রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নাবিয়া পেঁড়ো,  
ইঁটাইঁটি ফাটাফাটি শেষে ॥

আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,  
হবু থবু তবু সাধ মনে।

ছোট্টে কত কষ্ট সোয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হোয়ে,  
গৃহিনী দেখিব কতক্ষণে ॥

পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত,  
শত শত চলিয়াছে পথে।

কেহ গাড়ি কেহ ডুলি, কেহ বা উড়িয়ে ধুলি,  
চোলে যায় নিজ মনোরথে ॥

এঁটে এঁটে তুলে এঁটে, যারা যায় পায় হেঁটে,  
নাহি কোঁচকা পিটে বোচকা ঝোলে।

ভবনে যাবার তরে,            পবনের বেগ ধরে,  
মাথার উপরে-জুতো তোলে ॥

স্নান পূজা কেবা করে,    কোঁচড়ে জলপান ভরে,  
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে ।

ছুই তিন ক্রোশ গিয়া,    গুড়ুকে আশ্রণ দিয়া,  
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥

গ্রামের নিকটে এলে,    হেলে বাদসার হেলে,  
এক পদে চলে দশ পদ ।

কাঁকে ঝুলি রুকোকেশ,    গো-দাগার মত বেশ,  
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥

অপরূপ ভাব তথা,            কি কব রহস্য কথা,  
নারীগণ দেখে যদি মুটে ।

বুকের বসন খোলা,    প্রেমভাবে হয়ে ভোলা,  
তাড়াতাড়ী বাড়ী যায় ছুটে ॥

ভিজ়ে চুল ভিজ়ে খোঁপা,    মুখে করে কত চোপা,  
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে ।

এসেছে অমুক রায়,    জিজ্ঞাসা করিয়া আর,  
বাবা কেন এলোনাকো দেশে ॥

এইরূপ সবাকার,            আনন্দের নাহি পার,  
প্রেমপূর্ণ সকলের মনে ।

খেদে নহে মন স্থির,    কেবল বহিছে নীর,  
বিরোগীর যুগল নয়নে ॥

সন ১২৫৫ সালে

## শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন ।

আইলেন ঋতুরায়, সবল শরদ ।  
পরিধান পরিপাটী, ধবল গরদ ॥  
বরদার প্রিয় ঋতু, নহেন বরদ ।  
প্রিয়পাত্র প্রভাকর, কেবল খরদ ॥  
তাঁর দৃষ্টি ঘোর রিষ্টি, কিরণ জরদ ।  
কার সাধ্য সহ্য করে, কে আছে মরদ ?  
না দেখি প্রজার প্রতি, কিছুই দরদ ।  
করপেতে করপেতে, হোয়েছে করদ ॥  
অতিশয় পেয়ে ভয়, নুকার নীরদ ।  
অসহ্য সূর্যের তাপে, শুকার ক্ষীরদ ॥  
গ্রীষ্মরোগে নিজে ঋতু, খাইল পারদ ।  
হইল কোন্দলকর্তা, সাক্ষাৎ নারদ ॥  
স্বভাবের দোষ হয়, 'কখন কি রোধ ?  
দেবঋষি সম স্মধু, বাধায় বিরোধ ॥

আপনি স্বতন্ত্র থাকে, রাত্রি আর দিনে ।  
 নিদাঘ বরষা হিম, বৃন্দ এই তিনে ॥  
 মাঝে মাঝে বরষা, প্রকাশ করে রিষ ।  
 কুলা প্রায় চক্র তার, নাহিমাত্র বিষ ॥  
 ভীষ্মবৎ গ্রীষ্ম দিনে, বিষম প্রবল ।  
 রজনীতে ধরে হিম, ভীমসম বল ॥  
 স্বভাবের ভাবাস্তর, ভাবভরা ভব ।  
 শরদের চিহ্ন মাত্র, শুভ্রাকার নভ ॥  
 শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি, লোকে এই বলে ।  
 সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে ॥  
 মধুভরে মনোলোভা, কিবা শোভা তার ।  
 ভূষার সুসার করে, উষার তুষার ॥  
 মনোহর সুধাকর, চারু কর ধরে ।  
 নিরস্তর সুধার, সুধার বৃষ্টি করে ॥  
 শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস ।  
 পরমেশী পার্বতীর, প্রতিমা প্রকাশ ॥  
 রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে ।  
 তথাপি পূজার হেতু, আরোজন করে ॥  
 অনিবার হাহাকার, অর্থবলহত ।  
 ঋণজালে বদ্ধ হোয়ে, অর্চনায় রত ॥  
 স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ ।  
 অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন ॥

বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু ।  
 গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু ॥  
 কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে ।  
 দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন টুড়ে টুড়ে ॥  
 পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্ত্রবোধহত ।  
 কথায় কথায় ক্রোধ, দুর্কাসার মত ॥  
 ক্ষুদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট ।  
 রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শূদ্রের নিকট ॥  
 পেনে কিছু গদ গদ, আশীর্বাদ মুখে ।  
 না পেনে বাপাস্ত গাল, অনর্গল মুখে ॥  
 বাজক পূজক যত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ ।  
 অবেষণ করিতেছে, পস্থা নিজ নিজ ॥  
 হড় বড় দড় বড়, মুখে বসে হাট ।  
 “অপবিত্র পবিত্রবা” উর্ক এই পাঠ ॥  
 পূজারির কার্য যত, সে কেবল রোগ ।  
 পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ ॥  
 দনুজদলনী দুর্গে, পতিতপাবনী ।  
 হিন্দুদের জাগকত্রী, তুমি মা জননী ॥  
 এই হেতু করি তব, প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ ।  
 স্মৃতে থাকিব সব, তোমার সন্তান ॥  
 এতদিন স্মৃতে বটে, রাখিয়াছ তারা ।  
 এবছর কেন দেখি, বিপরীত ধারা ?

## কবিতামঞ্জরী ।

খাও খাও, পূজা খাও, করিনে বারণ ।  
 এবার মা দুর্গে তুমি, দুর্গের কারণ ॥  
 তোমার পূজার জাঁক, বাজে ঘণ্টা শাঁক ।  
 পরাভব করে তার, রোদনের হাঁক ॥  
 ধরেছ মোহিনী মূর্তি, দেবী দশভূজা ।  
 দশহস্ত বিস্তারিয়া, হুখে খাও পূজা ॥  
 ধন্য ধন্য ধন্য দেবি, ধন্য তোর পেট ।  
 চালি কলা শসা মূলা, কত লও ভেট ॥  
 দধি খাও, ক্ষীর খাও, খাও মণ্ডা গজা ।  
 মহিব মরাল খাও, খাও মেঘ অজা ॥  
 খাও কত ঘড়া গাড়ু, রজত পিতল ।  
 তথাপি উদর-অগ্নি, না হয় শীতল ॥  
 তব ভক্ত অনুরক্ত, প্রজা সমুদয় ।  
 অপমানে ক্রমে সব, ত্রিস্রমাণ হয় ॥  
 হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজা রাধাকান্ত ।  
 সুধান্নিক সুশীল, সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥  
 শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ, যে জন তোমারে ।  
 প্রতিদিন পূজা দেয়, নানা উপচারে ॥  
 হার খেদ মর্ষভেদ, খেদ কব কারে ।  
 অবিচারে স্নেহ রাজা, জেলে দিলে তারে !  
 হইলে আনন্দময়ী, নিরানন্দকরা ।  
 রাজ-অপমানে হোলো, শোকে পূর্ণ ধরা ॥

কোথায় হইব সুখী, সুখের আশ্বিনে ।  
 রোদনের ধ্বনি হুল, বোধনের দিনে !  
 রস রঙ্গ গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ ।  
 রঙ্গভরা বঙ্গদেশে, সমুদয় রোধ ॥  
 আশুতোষ আশুতোষ, সৰ্বদোষহত ।  
 দান ধ্যান যাগ যজ্ঞে, অবিরত রত ॥  
 গত বারে তুমি তাঁরে, হইয়া সদয় ।  
 সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে, প্রাণের তনয় ।  
 দীন-দয়াময়ী দেবী, এই তব দয়া ।  
 করিলে বিজয়া-দিনে, গিরিশ বিজয়া !  
 দেবপুরী অন্ধকার, তবু কেন হেষ ?  
 ধন নিয়া টানাটানি, করিতেছ শেষ ॥  
 ছিলেন অনাথ-নাথ, শ্রীহারকানাথ ।  
 ঝাঁর নাম স্মরণেতে, হয় সুপ্রভাত ॥  
 তুলিতে তুলনা ঝাঁর, তুলো কোথা রয় ।  
 হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয় ॥  
 সতত সরল মনে, ঝাঁর পরিবার ।  
 করেন কেবল সুখে, পর উপকার ॥  
 এমন ঠাকুবপুরে, মনস্তাপ দিলে ।  
 ভাসাইলে পৃথিবীরে, ছুঃখের সলিলে ॥  
 এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনে ।  
 কোনরূপ সুখ নাই, মানুষের মনে ॥













ওই দেখ প্রতি দলে,                      কুমুদিনী মুখ ছলে,  
 করিতেছে হিম অশ্রধারা ॥

ফুটিল কমলাবলী,                      অলি তাহে কুতূহলী,

\*                      \*                      \*

গুঞ্জরে মধুর স্বর,                      অঙ্গে করে ধর কর,  
 চক্ মক্ চঞ্চল কিরণ ॥

গাইতে নলিনী-গুণ,                      অতিশয় স্ননিপুণ,  
 গাও গাও উচিত ভোমার ।

বথা যেই উপকৃত,                      তথা সেই উপকৃত,  
 কৃতজ্ঞতা ধর্মের আচার ॥

কিন্তু দেখ প্রজাপতি,                      রসপানে রত অতিক  
 ফলে গুঞ্জ রব নাহি মুখে ।

অকৃতজ্ঞ নর যেই,                      তাহার তুলনা এই,  
 রীতি হেরি মজে লোক হুখে ॥

এইরূপ শরদের,                      নব শোভা প্রভাতের,  
 প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে ।

হায় হায় একি ক্রত,                      চঞ্চল চরণযুত,  
 হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে ॥

সে দিনে শরদ গেলো,                      আবার ফিরিয়ে এলো,  
 সুখময় শারদীয় পূজা ।

ঘরে ঘরে দেখা যায়,                      আনন্দের স্রোত ধায়,  
 নিয়মিত দেবী দশভূজা ॥

প্রতি দিন উষাকালে,                      স্নমধুর বাদ্য তালে,  
 গীত হয় আগমনী গীত ।  
 তনিয়া বিমুক্ত মন,                      যতেক ভাবুকগণ,  
 হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥



## শীত ।

জলের উঠেছে দাঁত,                      কার সাধ্য দেয় হাত,  
 আঁক করে কেটে লয় বাপ ।  
 কালের স্বভাব দোষ,                      ডাক ছাড়ে ফোঁস্ ফোঁস্,  
 জল নয় এ যে কাল সাপ ॥  
 অগ্নির পুলকাবে,                      কত সুখ মনে ভাবে,  
 যত সুখ রবির কিরণে ।  
 কুচুঁষের কটু বাণী,                      তাহে ক্লেশ নাহি মানি,  
 যত ক্লেশ শীত-সমীরণে ॥  
 বলবান বড় বড়,                      সবে হয় জড় শড়,  
 হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে ।  
 গায়ে কাঁটা জর জর,                      সদা করে থর থর,  
 কল্পিত কদলী যেন ঝড়ে ॥  
 নিশির না যায় রিষ্টি,                      শিশির সতত বৃষ্টি,  
 ঋষির তাহাতে ভাদে ধ্যান ।

বিষম প্রবল হিম,                      যে জন সাক্ষাৎ ভীম,  
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান ॥

সন্ন্যাসী মোহন্ত যত,                      মাঠে ঘাটে শত শত,  
মুহনী গাঞ্জার দম নিয়া ।

ছাই ভস্মে লোম ঢাকে,                      বম্ বম্ মুখে হাঁকে,  
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া ।

যেই জন ভাগ্যধর,                      গদী পাতা পাকা ঘর,  
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিনী ।

আহার তাহার মত,                      বিহার বিবিধ মত,  
তাহারে জীবন মুক্ত গণি ॥

ধনির শরীরে সাল,                      গরিবের পক্ষে শাল,  
কঞ্চল সঞ্চল করি রয় ।

বেণের পুঁটুলি হোয়ে,                      শুয়ে থাকে শীত সোয়ে,  
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥

চিরজীবি ছেঁড়া কাঁথা,                      সর্কক্ষণ বুকে গাঁথা,  
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে ।

শয়নের ঘর কাঁচা,                      ভার হয় প্রাণে বাঁচা,  
জাড় তার বিক্রে হাড়ে হাড়ে ॥

সকালে খাইতে চায়,                      আয়োজনে বেলা যায়,  
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত ।

শীতের কেমন খড়ি,                      উত্তায় অঙ্কের খড়ি,  
ফাটায় সবার পদ হাত ॥





চন্ চন্ হাত খাঁক্ৰি,                      ভরসা মুড়ির চাক্ৰি,  
পান মাত্র খেজুরের রস ॥

অভিমানী বাবু যারা,                      প্রাণে সারা হয় তারা,  
সাল বিনা মান নাহি রহে ।

ঘুচিল মুখের চোট,                      ইয়ারের নাহি জোট,  
মনের আঁগুনে শুধু দহে ॥

উড়ানী চাদর যত,                      এখন আদরহত,  
আগে যাহে অভিমান রোতো ।

শীত তুই বেশ বেশ,                      দেখিয়া শীতের বেশ,  
জানিলাম কে বাবু কে ফোঁতো ॥

ইয়ারেরা গদ গদ,                      কেহ গাঁজা কেহ মদ,  
কেহ বা চরসে দিয়া টান্ ।

কাছে রেখে অবলায়,                      দিবে চাটি তবলায়,  
মনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥

কেবা বুঝে সুর বোল,                      কেবল ভেড়ার গোল,  
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি ।

অপরূপ গলা সাধা,                      বলে বুঝি ডাকে গাধা,  
ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি ॥

সাহেবে রাখিয়া বাজি,                      লয়ে তাজি তাজি বাজী,  
দমবাজি কারসাজি কত ।

সোয়ার হাঁকায় চোটে, বোড়া পায় সোড়া ছোটে,  
বাজীবলে বাজি বল হত ॥

# বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ ।

শরদ ছিলেন রাজা, এই পৃথিবীদেশে ।  
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য, কার্তিকের শেষে ॥  
কাপুনী হিমালয়ী ছই, মহিষী সহিত ।  
উপনীত মহাবীর, মহিপাল শীত ॥  
প্রকাশ করিয়া নাম, হিম ঋতু নামে ।  
করিলেন রাজধানী, হিমালয় ধামে ॥  
ফাটাফোটা সেনাপতি, বল ধরে কত ।  
আহা উছ, হিহি ছছ, সেনা শত শত ॥  
যাজ্ঞয় বিজয়-কাড়া, উত্তরের বায়ু ।  
স্বল্প আর বিরহির, নাশ করে আয়ু ॥  
শিশির বিষম দুঃখ, পতির বিলাপে ।  
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান, শিশির-প্রতাপে ॥  
কুআশার ধ্বজা উড়ে, সন্ধ্যা আর প্রাতে ।  
বিশেষ কে বুঝে কত, কুআশয় তাতে ॥

নলিনী মলিনী মানে, বকুবলহত ।  
 প্রেমানন্দে প্রক্ষুটিত, গাঁদাফুল বত ॥  
 শশীশূর্য্য তেজোহীন, রাজার প্রতাপে ।  
 আকাশে কেবল ভয়ে, থর থর কাঁপে ॥  
 শাসন করিল খুব, চারিদিক রুকে ।  
 কার সাধ্য বাপ বাপ, জল দেয় মুখে ?  
 জলের হয়েছে দাঁত, হাত দেওয়া দায় ।  
 পান পান দুই রুদ্ধ, খড়ি উড়ে গায় ॥  
 দিন দিন দীন দিন, প্রাণ তার হরে ।  
 বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশা বুদ্ধি করে ॥  
 দীনের দারুণ দায়, দুঃখ যায় কিসে ।  
 দিন যায় নিশা তায়, নাহি কোন নিশে ॥  
 এ সময়ে নানারূপ, খাদ্য-সুখ বটে ।  
 কালগুণে কিছু তাহে, বিপরীত ঘটে ॥  
 শীত-ভয়ে ঝোল ঝাল, নাহি লয় চেয়ে ।  
 বাঁচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, সুকো রুকো খেয়ে ॥  
 আঁচাবার ভয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে ।  
 ইচ্ছা মনে যদি হয়, মুখে দেয় তুলে ॥  
 প্রচার হইল খুব, শীতের বিক্রম ।  
 করিয়া আসন জারি, শাসন বিষম ॥  
 সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ, সুখ কিসে হবে ?  
 বড় বড় বীর বত, জড়সড় সবে ॥

এইরূপে দুই মাস, লয়ে সেনাজাল ।  
 করিলেন রাজকার্য্য, শীত মহীপাল ॥  
 বসন্ত গুনিল সব, হিমের ব্যাভার ।  
 সুখের ধরণী রাজ্য, করে ছারখার ॥  
 প্রজা মধ্যে কোন মতে, সুখী নহে কেহ ।  
 শীত-ভয়ে থর থর, জ্বর জ্বর দেহ ॥  
 ঘুচাইতে পৃথিবীর, দুঃখ সমুদয় ।  
 মনেতে হইল তাঁর, ক্রোধ অতিশয় ॥  
 দেখিব কেমন সেই, ছুঁই ছুরাচার ।  
 এখনি হরিয়া লব, সব অধিকার ॥  
 মলয়া পর্বতে বসে, গোঁপে দিয়া পাক ।  
 দক্ষিণে বাতাস বলি, ছাড়িলেন হাঁক ॥  
 আইল দক্ষিণে বায়ু, শব্দ ফুর ফুর ।  
 অকালে ডাকিলে কেন, রাজা রাহাহুর ॥  
 রাজা কন সাজ সাজ, বীর সেনাপতি ।  
 অবনীমণ্ডলে চল, যাই শীঘ্র গতি ॥  
 কোন প্রজা সুখী নহে, শীতের শাসনে ।  
 লইব তাহার রাজ্য, অভিলাষ মনে ॥  
 কামের কামান তার, লোভ গোলা রেখে ।  
 গোটা দুই কোকিলেরে, শীঘ্র লও ডেকে ॥  
 স্বকীয় সৈন্যের সহ, বসন্ত ভূপাল ।  
 আইলেন অবনীতে, বিক্রম বিশাল ॥

সিংহাসন প্রাপ্ত হোয়ে, ঋতুপতি শীত ।  
 স্বামী সঙ্গে রসরঞ্জে, ছিল হরষিত ॥  
 সবিশেষ নাহি জানে, কোন সমাচার ।  
 পাত্র মিত্র সেনাগণ, সেরূপ প্রকার ॥  
 হঠাৎ বসন্ত আসি, হইয়া প্রকাশ ।  
 একেবারে সমুদয়, করিল বিনাশ ॥  
 না রহিল কোন চিহ্ন, সব গেল উঠে ।  
 উত্তরে বাতাস ভয়ে, পলাইল ছুটে ॥  
 কোথায় রহিল হিম, দেখা নাহি আর ।  
 বসন্ত প্রভাবে মার, করে মার মার ॥  
 মলয়া পবন দিলে, অতিশয় হেঁকে ।  
 সিংহাসনে ঋতুরাজ, বসিলেন জেঁকে ॥  
 বিরহী শাসন হেতু, লোয়ে খাঁড়া ঢাল ।  
 কুহু রবে ডাক ছাড়ে, কোকিল কোটাল ॥  
 নাম মাত্র মাঘ মাস, ঘোর শীতকাল ।  
 বড় বড় শাল হল, বড় বড় সাল ॥  
 সকলের মহানন্দ, বসন্তের বলে ।  
 অধিকন্তু হাফ ছুখী, ইয়ারের দলে ॥  
 উড়ানি উড়িয়ে গায়, দমে দম ছাড়ি ।  
 ছুড়ি মেরে যায় সবে, ইয়ারের বাড়ী ॥  
 শীত ঋতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে ।  
 মনে মনে ভাবে বসে, অভিমান লোয়ে ।

কি করিব, কোথা যাই, বাক্য নাহি ফুটে ।  
 অত্যাচারে ছরাচার, রাজ্য নিলে লুটে ॥  
 ঘোর দায় সহুপায়, নাহি পায় বীর ।  
 অনেক ভাবিয়া শেষ, যুক্তি করে স্থির ॥  
 প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ, ধর্মশীল অতি ।  
 অবশ্য করিবে কৃপা, আমাদের প্রতি ॥  
 এ বিপদে রক্ষাকর্তা, আর কেবা আছে ।  
 এই ভেবে উপনীত, বরষার কাছে ॥  
 কাঁপুনী হিমালী ছই, প্রিয়তমা নিয়া ।  
 দুঃখের কাহিনী সব, कहিলেন গিয়া ॥  
 বরষা আহ্বান করি, আলিঙ্গন দিয়া ।  
 রাণী সহ বসিলেন, সিংহাসনে গিয়া ॥  
 বস বস স্থির হও, শান্ত কর মন ।  
 দেখিব কেমন সেই, দান্তিক দুর্জন ॥  
 একেবারে বসন্তেরে, প্রাণে কোরে বধ ।  
 তোমারে করিব দান, পৃথিবীর পদ ॥  
 যখন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ ।  
 তখন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ ॥  
 জলদেরে ডাক দিয়া, করেন আদেশ ।  
 ধরনীমণ্ডলে তুমি, করহ প্রবেশ ॥  
 অধাশ্রিত বসন্তেরে, করিয়া নিধন ।  
 শীতরাজে দেহ গিয়া, নিজ সিংহাসন ॥

জলদ জলদ সেজে, অগ্রসর হোয়ে ।  
 যুদ্ধহেতু বসিলেন, হিমরাজে লোয়ে ॥  
 কামান কামান নয়, বজ্র তোপ ছাড়ে ।  
 ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলি, অন্ধকার বাড়ে ॥  
 কাপ্তেন পূবের বায়ু, দিয়া খুব ফের ।  
 চারি দিক ঘুরে করে, ফায়ের ফায়ের ॥  
 বসন্ত পড়িল দায়ে, সব হল ভুট ।  
 প্রাণ ভয়ে রাজ্য ছেড়ে, উঠে দিলে ছুট ॥  
 বহিছে উত্তর পূবে, অতি ধীরে ধীরে ।  
 দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে ॥  
 যে কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু স্বরে ।  
 এখন সে শীত ভয়ে, উহু উহু করে ॥  
 ভাসিল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে ।  
 রাজপাটে রাজা হিম, বসিলেন কেঁচে ॥  
 শীতের সেরূপ জয়, বসন্তের দলে ।  
 সা সূজা যেমন জয়ী, ইংরাজের বলে ॥

---

## বসন্ত বিরহ ।

যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয় ।  
বসন্ত পীযুষ সম, বিষোপম হয় ॥  
কোকিলের কুহরবে, কুহক লাগায় ।  
আমার হৃদয়ে আসি, বিঁধে শেল প্রায় ॥  
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন ।  
আকুল করিল তার, অভাগীর মন ॥  
পলাসে বিলাস করে, মালতীর লতা ।  
প্রবল করয়ে তার, মনোগলিনতা ॥  
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা ।  
প্রজাপতি বসে ধরি, মনোহারী প্রভা ॥  
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ ।  
ভুলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ ॥  
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান ।  
যে দিকে সৌরভ ছোটে, সে দিকে পয়ান ॥  
সেই মত আমারে, ভুলালে অরসিক ।  
আশাপথ চেয়ে, আঁধি হোলো অনিমিখ ॥



## চতুর্থ খণ্ড ।

যুদ্ধবিষয়ক ।

### শীক সংগ্রাম ।

বিজ্ঞবর গবর্ণর, হিতবাক্য ধর ।  
শঙ্কটে সমর সজ্জা, সম্বরণ কর ॥  
নরবর গবর্ণর, মনে এই ভয় ।  
রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয় ॥  
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধভাব, লাগিয়াছে ধুম ।  
উর্দ্ধভাগ রুদ্ধ করে, কামানের ধুম ॥  
শীকের এবার বৃষ্টি, নাহিক নিস্তার ।  
বিপক্ষ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিস্তার ॥  
ত্রিটিসের জয় জন্তু, অভিলাষ মনে ।  
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে ॥  
আপনি চালাও সেনা, রণক্ষেত্রে রয়ে ।  
এমন কে করে আর, গবর্ণর হয়ে ?  
মহামতি সেনাপতি, সঙ্গে সঙ্গে যোড়া ।  
বিপক্ষের গুলি খেয়ে, মলো তাঁর ঘোড়া ॥

বড় বড় বলবান, বোকা বোকা যত ।  
 ভূমিতলে নিদ্রাগত, জনমের মত ॥  
 লিখিতে উদয় ছুঁখ, লেখনীর মুখে ।  
 সেলের মরণ শুনি, শেল কুটে বুকে ॥  
 এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্র ধরি বলে ।  
 মরিল শীকের হস্তে, সমরের স্থলে ॥  
 হার হার এই ছুঁখ, কিসে হবে দূর ।  
 ব্রিটিসের রক্ত খায়, শৃগাল কুকুর !  
 স্বামির মরণ শুনি, বিবিলোক ধারা ।  
 নিরত নয়ন-মেঘ, বহে শোকধারা ॥  
 শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ ॥  
 অবশ্য হইবে তার, হিংসা পরিশোধ ॥  
 নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শীক ।  
 ধর্মরাজ খাতা খুলে, কষিবেন ঠিক ॥  
 অমর সমরকলে, ব্রিটিসের সেনা ।  
 পিস্তীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা ॥  
 লইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোপ ।  
 নির্ভয়েতে বোকা সব, কর ভাই হোপ ॥  
 শতলজ পার হয়ে, জোরে ছাড় তোপ ।  
 উড়ে যাক শীকমুণ্ড, পুড়ে যাক গৌপ ॥  
 বিপক্ষের পরাক্রম, সব করি লোপ ।  
 শতক্রতে স্নান করি, গায়ের মাথ সোপ ॥

কিকপেতে পরিপূর্ণ, সময়ের স্থল ।  
কিরূপে করিছে যুদ্ধ, ইংরাজের দল ॥  
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা ।  
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে, উড়ি যাই তথা ॥  
দূরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা অমুরাগে ।  
গুলি যেন ছুটে এসে, গায়ে নাহি লাগে ॥



## যুদ্ধের জয় ।

সেফালিকা পদ্য ।

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়,  
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ।  
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥



কালগুণে বিপরীত, বৃষ্টিবার ভ্রম ।  
এসেছিল শীক সর্ব করিয়া বিক্রম ॥

বামনের অভিলাষ, ধরিবেক শশী ।  
 উর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি ॥  
 তুরঙ্গের ধরগতি, ধর করে শক ।  
 বাসকি করিতে বধ, বাঞ্ছা করে বক ॥  
 কাকের কোকিল রবে, লজ্জা নাহি হয় ।  
 গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥  
 শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ।  
 রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

---

পঞ্জাবীয় শীকদের, আশা ছিল মনে ।  
 ব্রিটিস বিনাশ করি, জয়ী হবে রণে ॥  
 সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হয়ে অগ্রসর ।  
 করিল শিবিরে আসি, সন্মুখ সমর ॥  
 প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল সাধন ।  
 দঙ্গল বাধিয়া করে, ঘোরতর রণ ॥  
 মাঠে এসে ফাটে বুক, মুখ শুষ্ক হয় ।  
 গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ।  
 শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ॥  
 রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ।

---

আমাদের সেনাদের, বাহুবল বাড়ে ।  
 বিকট বদনে ঘোর, সিংহনাদ ছাড়ে ॥  
 বেঁধে হোপ করে কোপ, দিলে তোপ দেগে ।  
 নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে ॥  
 যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে ।  
 রেজিমেণ্ট করে সেন্ট, তাঁবু টেণ্ট ফেলে ॥  
 ঘেঁষ ছেড়ে দেশে গিয়া, মানে পরাজয় ।  
 গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥  
 শতলজ পার হলো শীক সমুদয় ।  
 রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

---

বিপক্ষের বড় বড় সরদার বারা ।  
 সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়, বল-বুদ্ধিহারা ॥  
 লাহোরে রানীর কাছে, অধোমুখে থাকে ।  
 ঘোর ছুর্গে ঢুকে ছুর্গে, ছুর্গে বলে ডাকে ॥  
 বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যত ।  
 আমাদের কাছে সব, শৃগালের মত ॥  
 নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরম্পর কর ।  
 গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥  
 শতলজ পার হলো শীক সমুদয় ।  
 রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

রণভূমি ছেড়ে যায়, যত চাঁপদেড়ে ।  
 গুলি গোলা অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে ।  
 মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে মন্দী-কূলে ।  
 বুকি-লোপ দাড়ি গোঁপ, সব যায় ঝুলে ॥  
 চড়াচড়্ মারে চড়্ সিফায়ের দলে ।  
 ধড়্ফড়্ করে ধড়, পড়ে ধরাতলে ॥  
 পুনর্বার উঠিবার; শক্তি নাহি হয় ।  
 গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥  
 শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ।  
 রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥



ভাগিয়াছে শত্রু সব, লাগিয়াছে ধূম ।  
 লুটিতে লাহোর দেন, হেনেরি ছকুম ॥  
 প্রাণপণ ছুঁটমন, সেনাগণ সাজে ।  
 মহাজাঁক ঘন হাঁক, জয়টাক বাজে ॥  
 শীকদেশ হয় শেষ, রণবেশ ধরে ।  
 চলে দল ধরাতল, টলমল করে ॥  
 ধরাধর কেঁপে উঠে, ধরা নাহি রয় ।  
 গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥  
 শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ।  
 রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

এ দেশের প্রজা সব, ঐক্য হয়ে মুখে ।  
 রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে ॥  
 ধন্য চিপ কমা গার, ধন্য দেও লর্ডে ।  
 ইংরাজের ব্যাক বাড়ে, থ্যাক দেও গড়ে ॥  
 গণা বটে সৈন্যগণ, ধন্য দেও তায় ।  
 লর্ডের রহিল মান, গডের কুপায় ॥  
 সদয় সমরকলে, বিভূ দয়াময় ।  
 গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥  
 শতলজ পার হলো, শত্রু সমুদয় ।  
 রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

## দ্বিতীয় যুদ্ধ ।

ভারতের অবোধ, দুর্বল লোক যত ।  
 ডাল্ ভাত মাচ্ খেয়ে, নিদ্রা যাবে কত ?  
 পেটে খেলে পিটে সয়, এই বাক্য ধর ।  
 রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর ॥  
 লাহোরের শীক সেনা, শত্রু অতিশয় ।  
 এখন আলস্ত করা, সমুচিত নয় ॥  
 কেহ খড়্গ, কেহ ঢাল, কেহ যষ্টি লও ।  
 বাহার যেমন সাধা, সেইরূপ হও ॥

করিতে তুমুল যুদ্ধ, আমাদের সনে ।  
 লাহোরীর প্রজাপুঞ্জ, সাজিয়াছে রণে ॥  
 আমরা তাদের সঙ্গে, রোকে রোকে রুকে ।  
 দাড়ি ধোরে দিব টান, বাড়ী মেরে নুকে ॥  
 অধিকার যদি পাই, শীকাদের ক্ষিতি ।  
 আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি ॥  
 সাহসে করিবে যুদ্ধ, যত বুদ্ধি ঘটে ।  
 কোম ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে ॥  
 অকর্ণণ্য শক্তিশূন্য, আফিসর ধারা ।  
 ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তাঁরা  
 শিরে রাখ বিলুদল, মুখে বল হরি ।  
 সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাত্রা করি ॥  
 গায়ে দেই চাপকান, পায়ে চটি জুতি ।  
 রাখার পাগড়ি বাঁধ, পর সাদা ধুতি ।  
 দোবজা দোছট করি, চোট কর মনে ।  
 হেঁচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে ॥  
 সাইনের অগ্রভাগে, যেওনাকো রুকে ।  
 চোট্ চোট্ কাট্ কাট্, মালসাট মুখে ॥





## মুদকির যুদ্ধ ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে ।  
রেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রঙ্গে ॥  
সেজেছে অগণ্য সৈন্য, কি কব বিস্তার ।  
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা, মাহিক নিস্তার ॥  
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্যা শত শত ।  
ছেড়েছে প্রাণের মায়া, যুদ্ধে হয়ে রত ॥  
ঘেরেছে সমর স্থল, লয়ে নিজ দল ।  
সেরেছে এবার শীকে, হইয়া প্রবল ॥  
মেরেছে বিপক্ষগণে, মুদকির রণে ।  
হেরেছে সকল শত্রু, গোরাদের মনে ॥  
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে, নদী পার হয়ে ।  
মেগেছে আশ্রয় পুন, মিত্রভাব লয়ে ॥  
হয়েছে সমূহ শীক, সমরে সংহার ।  
বয়েছে চক্ষের যোগে, বন্ধে বারিধার ॥  
লয়েছে হুংখের ভার, শিরোপরে কত ।  
রয়েছে প্রমাণ তার, তোপ একশত ॥



বহুসৈন্য লোয়েছিল, গুলিগোলা বোয়েছিল,  
হোয়েছিল পূর্বপারবাসী ।

যত কথা কোয়েছিল, আমাদের সোয়েছিল,  
রোয়েছিল সম্মুখেতে আসি ॥

কালবেশ ধোরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হোরেছিল,  
কোরেছিল ভয়ানক গতি ।

বহুলোক ছোরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল,  
মরেছিল বহু সেনাপতি ॥

যত ঠাপদেড়ে ছিল, দাড়ী গোপ নেড়েছিল,  
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে ।

ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল,  
মেড়েছিল বাকুদ তাহাতে ॥

বড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল,  
ঝেড়েছিল গুলিগোলা আগে ।

গোরা শেষ চেড়েছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল,  
তেড়েছিল অতিশয় রাগে ॥

শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল,  
তেগেছিল বিপক্ষের বুকো ।

গারে গোলা লেগেছিল, শীক সব ভেগেছিল,  
মেগেছিল পরাজয় মুখে ॥

মার রব মুখেছিল, বাহুমধ্যে ঢুকেছিল,  
বুকে ছিল কামানের জোব ।

রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে চুকেছিল,  
 ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর ।  
 কোপে গুলি ছুঁড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল,  
 জুড়েছিল আকাশ পাতাল ।  
 শীকমুণ্ড উড়েছিল, দাড়ি গোঁপ পুড়েছিল,  
 খুঁড়েছিল ধরি তরবাল ॥  
 শক্রদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল,  
 চোটেছিল মহিষীর মন ।  
 ডঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল,  
 এঁটেছিল করিয়া শাসন ॥



## যুদ্ধের জয় ।

থাঙ্ক লাড্ ধনা তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,  
 শীক-রক্তে প্রবাহিত নদী ।  
 এক হস্তে এ প্রকার, না জানি কি হোতো আর,  
 দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি ॥  
 বুদ্ধে বুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর,  
 মহিমার নাহি হয় শেষ ।  
 ডিউকের হয়ে পাটি, বধ করি বোনাপাটি,  
 রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ ॥

তুলনা তোমার কাছে,      তুল্য গুণ কার আছে,  
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে ।

প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া,      সাহসে সফল ক্রিয়া,  
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে ॥

ধিক ধিক শীকপক্ষ,      কিসে হবে প্রতিপক্ষ,  
কোনরূপে লক্ষ্যণীয় নয় ।

যুদ্ধ করি উপলক্ষ,      এসেছিল কত লক্ষ,  
লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয় ॥

না জেনে বিশেষ হেতু,      বান্ধিল নৌকার সেতু,  
কালকেতু ধূমকেতু শীক ।

বলহীন হয়ে শেষে,      ঢুকিয়া আপন দেশে,  
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক

আমাদের সেনা সব,      গেরে সবে করে শব,  
ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে ।

গুলি গোলা নিলে কেড়ে,      যত ব্যাটা চাঁপদেড়ে,  
পলাইল পূর্বপার ছেড়ে ॥

গোরা সব রাগে রাগে,      জোর করি তোপ দাগে,  
কামানের আগে বায় উড়ে ।

কোরে কোপ বুদ্ধি লোপ,      মিছে হোপ খেয়ে তোপ,  
দাড়ি গোঁপ সব গেল পুড়ে ॥

শীক শত্রু পরাভব,      মুখে আর নাহি রব,  
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে ।



জোরজার শোরসার,                      ঘোরঘার ফেরফার,  
নাহি আর বিপক্ষের দলে ।

শ্বেত সৈন্য সবাকার,                      বৃদ্ধি হলো অহঙ্কার,  
বার বার মার মার বলে ॥

ধন্য লর্ড গবর্নর,                      ধন্য চিপ কমেণ্ডর,  
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি ।

ধন্য ধন্য সৈন্য সব,                      ধন্য ধন্য ধন্য রব,  
ধন্য ধন্য ত্রিটিসের রতি ॥

শক্রচয় পেয়ে ভয়,                      রণে হয় পরাজয়,  
সমুদয় হলো ছারখার ।

শতদ্রু সলিল অঙ্গে,                      কুধির তরঙ্গ রঙ্গে,  
বিভূষিত শীকশবহার ॥

শ্রোতে সব শব ভাসে,                      বাতাসে পুলিনে আসে,  
কি কহিব ভয়ানক কথা ।

গৃহপাল ফেরুপাল,                      শকুনি গৃধিনীজাল,  
শবাহারে সব হারে তথা ॥

আজ্ঞা পেয়ে আপনার,                      হলো সব নদী পার,  
অধিকার করিতে লাহোর ।

বিপক্ষের ঘোর দুর্গ,                      লুটিল সকল দুর্গ,  
ত্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর ॥

মহারানী শীকেশ্বরী,                      শিশু সূত ক্রোড়ে করি,  
দারুণ দুঃখিত অহরহ ।





## চপলাবলী ছন্দ ।

হে, গব, নর । মানব, বর ।  
রণ স, স্বর । বচন, ধর ॥  
ত্রিটিস, গণে । অভয়, মনে ।  
শীকের, সনে । সেজেছে, রণে ॥  
লাহোরা, ধিপ । শিশু দ, লিপ ।  
ভার স, মীপ । সমর, দীপ ॥  
ধনের, আশ । করি প্র, কাশ ।  
প্রাণী বি, নাশ । দয়া না, বাস ॥  
স্বরূপ, বটে । সকলে, রটে ।  
শতক্র, তটে । পাছে কি, ঘটে ॥  
তোমার, কার্য । নহে নি, বার্য ।  
পাইবে, ধার্য । শীকের, রাজ্য ॥  
না হয়, ভঙ্গ । রণ ত, রঙ্গ ।  
শোণিত, রঙ্গ । শোভিত, অঙ্গ ॥  
দেখিয়া, রীতি । হাসিছে, ক্রিতি ।  
ধনের, প্রতি । এত কি, প্রীতি ॥  
সমর, স্থলে । কামান, কলে ।  
বিপক্ষ, দলে । বধিবে, বলে ॥

শীকের, পাপে । তোমার, দাপে ।  
 রণ প্র, তাপে । অবনী, কাঁপে ॥  
 বিকট, বেশে । রুধিরে, ভেসে ।  
 লাহোর, দেশে । কি হবে, শেষে ॥  
 শীক ভূ, পাল । জুধের, বাল ।  
 তারে কি, কাল । যাতনা, জাল ॥  
 হে গুণ, নিধি । বিফল, নিধি ।  
 এ নহে, বিধি । বিদিত, বিধি ॥  
 করুণা, কর । করুণা, কর ।  
 রণ না, কর । সমর, হর ॥

## কাবুলের যুদ্ধ ।

সন ১২৪৮ সাল ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, ভেগেছে কাবুল সুদ্ধ,  
 দেগেছে কামান শত শত ।  
 ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,  
 রেগেছে ইংরাজ লোক যত ॥  
 করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,  
 তরেছে সমরে খুব তারা ।

পরেছে করাল বঙ্গ, ধরেছে সকল অস্ত্র,

মরেছে প্রধান যোদ্ধা বারা ॥

হরেছে সজ্জম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,

রয়েছে দুখের ভার বৃকে ।

রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,

করেছে কুরাক্য কৃত মুখে ॥

দেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ,

হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে ।

চেতেছে এবারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল,

পেড়েছে কামান কত রণে ॥

জুড়েছে বন্দুকে গুলি, উড়েছে মাথার খুলি,

পুড়েছে কপাল নানামতে ।

বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল,

পেতেছে সে পাহাড়ের পথে ॥

সমর করিয়া পণ্ড, সেনা সব লণ্ডভণ্ড,

অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ ।

জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তারা,

কোনরূপে স্থির নহে কেহ ॥

শ্বেতকান্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার,

অনিবার হাহাকার রব ।

শৃগাল কুকুর কত, গৃধিন্যাদি শত শত,

মহানন্দে খায় সব শব ॥



সুকাইল রাঙামুখ,                      ইংরাজের এত দুখ,  
ফাটে বুক হায় হায় হায় !

চারিদিকে গুলি গোলা, কোথা পাবে দানা ছোলা,  
অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে ।

থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে,  
বাঁচে শুধু দড়ী গৌজ খেয়ে ॥

পাঁছাড়ে সেনার বাস,            সেখানে যে আছে বাস,  
চরে খেতে সোরে পড়ে পদ ॥

নিশির শিশির ছুঁষ্ট,            দিবসে তপন রুঁষ্ট,  
বিধিমতে বিষম বিপদ ॥

ফলে কিছু নহে অন্য,            নিশ্চয় মরণ জন্য,  
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা ।

ববনের যত বংশ,                    একেবারে হবে ধ্বংস,  
সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা ॥

ছুটিবে যখন গুলি,                    উটিবে আকাশে ধূলি,  
ফুটিবে বিপক্ষ বুক শূল ।

লুটিবে ঘোড়ার পায়,                কুটিবে শরীর তায়,  
টুটিবে সকল দেড়ে কুল ।

জলেছে গবর্ণর ক্রোধে,            বলিছে বিষম বোধে,  
চলেছে সাম্রাজ্য ছল করে ।

ফলেছে কামনা ফল,                চলিছে সেনার দল,  
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥



কলে চলে জলে তরি, ধূম্রযোগে টান ।  
 এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান ॥  
 হোয়েছেন কমডোর, সবার প্রধান ।  
 কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ভ্রাণ ॥  
 জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আগুমান ।  
 কোথা রবে মগেদের, বগমারা বাণ ?  
 লাফে লাফে বীরদাপে, শক্ৰ আন্ সান্ ।  
 পাতালেতে বাসুকির, দেহ কম্পবান ॥  
 রেঙ্গুণের গবানর, হবে হতমান ।  
 আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বঁদিয়ান ॥  
 হোরা দিয়া গোরা সব, খেতে দিবে ধান ।  
 অথবা করিবে তার, দেহ খান খান ॥  
 কি করে আবার রাজা, যুবা জাম্বুবান ।  
 ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান ॥  
 ইংরাজ সহিত রণে, পাইবে আসান ।  
 ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান ॥  
 ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রাণিধান ।  
 কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুল মান ॥  
 শোভা পেতো হোলে পরে, সমান সমান ।  
 পৰ্ব্বতের সহ কোথা, তুণের প্রমাণ ?  
 বন্দীরূপে রবে কিন্তু, যাবেনাকো প্রাণ ।  
 “বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে” পাবে বসতির স্থান ॥

সেখানে খীষ্টান হোয়ে, ঢেঁকির প্রধান ।  
 ঢেঁকির নিকটে লবে, ধর্মের বিধান ॥  
 ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান ।  
 মেকাই একাই তারে, করিবেন আণ ॥



অনল উঠিল জ্বালে, কে করে নির্বাণ ।  
 সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্বাণ ॥  
 ত্রিটিস নিকটে তথা, মগের প্রতাপ ।  
 অলস্ত আগুনে যথা, পতঙ্গের বাঁপ ॥  
 ফণি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর ।  
 ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥  
 হোতে চায় করী সম, সুরূপ শূকর ।  
 তুরগের ধরগতি, ইচ্ছা করে ধর ॥  
 দেখিয়া রবির ছবি, নাচিছে জোনাকী ।  
 বকের বাসনা বড়, বধিতে বাসকী ॥  
 শুনীশুত মিছে কেন, করিছে আক্রম ।  
 হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম  
 ভীক ফের রব করি, জয় করে হরি ।  
 হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি ॥  
 ইংরাজে করিবে দূর, কদাকার মগে ।  
 কোথায় লাগেন, “বগা বাজালের লগে ॥”



ধোরে থাক্ পাখাভাঙ্গা, মাচরাঙ্গা খগে ।  
 বাঁধুক আবার অঙ্গা, দোকা চুণ রগে ॥  
 রাঙ্গামুখা দল বদি, বল করে ভালো ।  
 আঁকা বাঁকা কালামুখ, আরো হবে কালো ॥



সন্ধিজলে রণানল, করিয়া নির্বাণ ।  
 আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ?  
 হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ ।  
 বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ ॥  
 নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যায় রাখা ।  
 মরণের হেতু উঠে, পিপীড়ার পাখা ॥  
 দ্বিজরাজে দর্প করে, হইয়া মালীক ।  
 অবোধ বগের প্রভু, মগের মালিক ॥  
 সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার ।  
 সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু, মানব আকার ॥  
 সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায় ।  
 কেবা রাজা, কেবা প্রজা, বুঝা অতি দায় ॥  
 শ্রীরামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া ।  
 মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, থামিয়া থামিয়া ॥  
 ইরেস্তা বুকুলি ভুলু, কামিয়া কামিয়া ।  
 \* নাচে আর গান গায়, থামিয়া থামিয়া ॥

কর্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে ।  
 আবাগতি হাবা অতি, বৃঞ্চিলাম ভাবে ॥

—:~:—

জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জালাবে ?  
 ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন ঢলাবে ?  
 শ্বেতবীর, বামুকির, উচ্চ শির টলাবে ।  
 রাজপুর, হয়ে চুর, রসাতলে তলাবে ॥  
 কোপে কোপে,তোপে তোপে,গিরিদেশ হেলাবে ।  
 জলে স্থলে, শত্রুদলে, কাটচেলা চেলাবে ॥  
 তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, ছুই হাতে চেলাবে ।  
 ডাক্ছাড়ি, তুলে আড়ি, গোঁপদাড়ি ফেলাবে ॥  
 কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাঁকা ডগ লেলাবে ।  
 ডুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেলা খেলাবে ॥  
 হত দিশে, বুঝে নিশে, কাণে সীমে ঢালাবে ।  
 মগাই পগাই শোণা, কামানেতে গালাবে ॥  
 সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, রাজধানী জালাবে ।  
 বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে ॥  
 যত গোরা, মেরে হোরা, ভাল ঝাল ঝালাবে ।  
 আবাগতি, হাবা ভূপ, বাবা বোলে পালাবে ॥

— o —

পঞ্চম খণ্ড ।

বিবিধ বিষয়ক ।

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা ।

তড়িৎগতি ছন্দ ।

হে নটবর, সর হে সর ।  
ছি ছি কি কর, বসন ধর ॥  
আমি অবলা, গোপের বালা ।  
হলো কি জালা, ছুঁয়োনা কালা ॥  
করিলে ভারি, বিষম জারি ।  
নয়ন ঠারি, বধিছ নারী ॥  
তুমি হে শঠ, দারুণ নট ।  
কুরব রট, রসিক বট ॥  
কি হাস হাস, কি ভাষ ভাষ ।  
লাজ না বাস, ভাব প্রকাশ ॥  
গোপী-সমাজে, ব্রজের মাজে ।  
এমন কাষে, মরিছে লাজে ॥  
আসিরা জলে, হৃদয় জলে ।  
কপাল ফলে, কি ফল ফলে ॥

চল হে চল, লইব জল ।  
 কি ছল ছল, কি বল বল ॥  
 আমি হে সতী, নব যুবতী ।  
 আয়ান পতি, দুর্জন অতি ॥  
 না জানে প্রেম, মনের ভ্রম ।  
 ননদী মম, সাপিনী সম ॥  
 ননদী-ডরে, শরীর জ্বরে ।  
 থাকিতে ঘরে, পাগল করে ॥  
 সরল নহে, স্বভাবে রহে ।  
 কু কথা কহে, জীবন দহে ॥  
 আপন বলে, কুপথে চলে ।  
 কথার ছলে, অসতী বলে ॥  
 বাঁকা ত্রিভঙ্গ, কর কি রঙ্গ ।  
 ছাড় হে সঙ্গ, ধরোনা অঙ্গ ॥  
 তব বচনে, প্রেম রচনে ।  
 গোপিনীগণে, হাসিছে মনে ॥  
 বিনতি করি, চরণে ধরি ।  
 কি কর হরি, সরমে মরি ॥  
 পাপ আয়ানে, শুনিলে কাণে ।  
 গঞ্জনা-বাণে, বধিবে প্রাণে ॥  
 তুমি গোপাল, পাল গোপাল ।  
 প্রণয় আল, কেন হে জাল ॥

গোকুলে থাক, গোধন রাখ ।  
 কি হাঁক হাঁক, কেন হে ডাক ॥  
 সুখ আধার, প্রেম ব্যাভার ।  
 কি ধার ধার, কি জান তার ?  
 বংশীর ধ্বনি, যেন হে ফনি ।  
 আমি রমণী, প্রমাদ গনি ॥  
 নিদয় বাঁশী, হৃদয়-ফাঁসি ।  
 করে উদাসী, ছুটিয়া আসি ॥

### দীর্ঘ পয়ার ।

ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ, ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ ।  
 কুলের কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ ॥  
 মরি মুরলীর স্বরে, মরি মুরলীর স্বরে ।  
 তোমার অধরে কেন, রাখা নাম ধরে ?  
 থাকি গুরুজন মাঝে, থাকি গুরুজন মাঝে ।  
 নাম ধরে বাজে বাঁশী, শুনে মরি লাজে ॥  
 ইথে কত রস আছে, ইথে কত রস আছে ।  
 কোন্ বাঁশী এই বাঁশী, পেলো কার কাছে ?  
 ছি ছি জান কত ছল, ছি ছি জান কত ছল ।  
 বাঁশরী কিশোরী বলে, পাসরি সকল ॥  
 বাঁশী কে বলে সরল, বাঁশী কে বলে সরল ?

খলের বদনে থাকে, উগরে গরল ॥  
 শুনে মনোহর বাঁশী, শুনে মনোহর বাঁশী ।  
 ছল কোরে জল নিতে, যমুনাতে আসি ॥  
 বাঁশী কত গুণ জানে, বাঁশী কত গুণ জানে ।  
 প্রাণ মন কেড়ে লয়, সুমধুর গানে ॥  
 কত তান ছাড়ে তানে, কত তান ছাড়ে তানে ।  
 প্রবেশে অমৃত রস, অবলার কাণে ॥  
 স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ, স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ ।  
 উথলে আবার তায়, প্রণয়-তরঙ্গ ॥  
 ভাল মুরলীর ভাব, ভাল মুরলীর ভাব ।  
 বিপরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥  
 মন যুক্ত সুখে দুখে, মন যুক্ত সুখে দুখে ।  
 অমৃত বরিষে বৃষ্টি, ভুঞ্জকের মুখে ॥  
 শুনি বল বিবরণ, শুনি বল বিবরণ ।  
 বংশীধর বংশী ধর, কিসের কারণ ?  
 তব বদন সরোজে, তব বদন সরোজে ।  
 গরজে রাধার নাম, কিসের গরজে ?  
 আমি গৃহে যাই চোলে, আমি গৃহে যাই চোলে ।  
 আর বাঁশী বাজায়োনা, রাধা রাধা বোলে ॥

## ভাব ও চিন্তা ।

ভাব, চিন্তা, এই দুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম ।  
মনোহর মনোদ্বীপে, উভয়ের ধাম ॥  
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয় ।  
অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয় ॥  
অধিকার করিয়াছে, ত্রিভুবন জুড়ে ।  
ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে ॥  
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নহে তারা ।  
অথচ উড়িয়া যায়, এ কেমন ধারা !  
উদয়ের প্রতি কিছু, হেতু তার নাই ।  
বিষয় বিশেষে শুধু, দেখামাত্র পাই ॥  
দেখা পেলো রাখা ভার, আশা লয় কেড়ে ।  
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে ॥  
পাছে পাছে ছোট্টে ইচ্ছা, ধরু ধরু কোরে ।  
আবার উদয় হয়, অন্তরূপ ধোরে ॥  
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গি যায় আশা ।  
আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা ॥

চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেষ ।  
 অবশেষে চিন্তায় ছাড়িতে হয় দেশ ॥  
 এক চিন্তা, চিন্তাবোগে, নানা মূর্ত্তি হয় ।  
 কখন কি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নয় ॥ \*  
 এই চিন্তা, মূর্ত্তিভেদে, অমুকুল যারে ।  
 ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে ॥  
 থাকেনা হুখের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে ।  
 সন্তোষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে ॥  
 এই চিন্তা সহকারে, উপকার যত ।  
 বিদ্যালাভ, বস্তুবোধে, মুখ লাভ কত ॥  
 এই চিন্তা, মূর্ত্তিভেদে, হুখের আধার ।  
 একেবারে-ধরে ঘোর, ভীষণ আকার ॥  
 কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা ।  
 আপনি বিনাশ করে, আপনার বাসা ॥  
 মনেরে করিয়া দন্ধ, তবু নয় স্থির ।  
 ক্রমেতে আহাির করে, সকল শরীর ॥  
 অমুকুল হও চিন্তা, আমার এ মনে ।  
 কোটি কোটি নমস্কার, তোমার চরণে ॥  
 ভাবের স্বভাব যাহা, তেবে বোঝা ভার ।  
 চিন্তা সহ সমভাব, সকল প্রকার ॥  
 ভাবের অভাব নাই, স্বভাবত রয় ।  
 সকল সময়ে কিন্তু, দেখা নাহি হয় ॥



নিজ ভাবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ ।  
 মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস ॥  
 অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্বক্ষণ থাকে ।  
 তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে ॥  
 ভাবেতে অনেক হয়, দুখের উদয় ।  
 পুনর্বার সেই দুখ, ভাবে হয় লয় ॥  
 বুকিলে নিগূঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে ।  
 সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে ॥  
 কন্ঠ, মন, বাক্য তিন, লুপ্ত এক ঠাই ।  
 অথগু ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই ॥

## হাস্য ।

রসময় বিধাতার, বিচিত্র কৌশল ।  
 সৃজিলেন “মুখ” রূপ, ভাবের মণ্ডল ॥  
 সুরাগ বিরাগ আদি, মানস আভাস ।  
 হয় এই ভাবাকর, বদনে বিকাশ ॥  
 এই মুখ-ভঙ্গিতরে, লাগ্ত যত লোক ।  
 কোথায় উদয় সুখ, কোথা উঠে শোক ॥  
 আনন কানন সম, ভাব তাহে শোভা ।  
 কভু নিরানন্দকর, কভু মনোলোভা ॥

বিষাদ বিষম বায়ু, বহিলে তথায় ।  
 ক্ষণমাত্রে সর্ব শোভা, লুপ্ত হোয়ে যায় ॥  
 তৃণ, দল, পুষ্প, ফল, প্রাপ্ত মলিনতা ।  
 শুষ্ক হয় ললিত, লাবণ্যরূপ লতা ॥  
 রাগরূপ খরতর, দিনকর-করে ।  
 বদন বিপিন-শোভা, একেবারে হরে ॥  
 নন্নন নিকুঞ্জপুরে, জলে দাবানল ।  
 দগ্ধ করে চতুর্দিক, হইয়া প্রবল ॥  
 এই রূপ বিবিধ, বিষমভাব যোগে ।  
 আনন অটবী-শোভা, ভ্রষ্ট হয় ভোগে ।  
 ফলে যবে সুখ সমীরণ বহে তথা ।  
 মধুর মাধুর্য্য মাত্র, শোভিত সর্বথা ॥  
 প্রফুল্ল নন্ননকুঞ্জে, পলক পল্লব ।  
 চঞ্চল পুতলি যেন, কুম্ববল্লভ ॥  
 গণ্ডুষোগে বিকসিত, হয় কোকনদ ।  
 সঞ্চারিত রসরূপে, সুরূপ সম্পদ ॥  
 হাসির হিলোল উঠে, অধর পুঙ্করে ।  
 দশন হংসের শ্রেণী, সুখেতে বিহরে ॥  
 হায়রে বিচিত্র ভাব, বলিহারি যাই ।  
 এমন মধুর বুদ্ধি, আর কিছু নাই ॥  
 দেখ হে রসিকগণ ! রমণী-বদনে ।  
 হাসির মাধুর্য্য কত, প্রণয় মিলনে ॥

বলিতে বচন নাই, সে রস সুরস ।  
 প্রমোদ-পয়োধি-জলে, নিমগ্ন মানস ॥  
 আর দেখ মানিনী, বিনোদ বিদ্বাধরে ।  
 হাস্য যোগে কত রস, রসিকে বিতরে ॥  
 যেমন বরষাকালে, মেঘাবৃত দিবা ।  
 অকস্মাৎ সূর্য্যোদয়ে, সূখোদয় কিবা ॥  
 অথবা শিশিরকালে, ফুল শতদল ।  
 মধুপানে মহাসুখী, মধুকরদল ॥  
 গর্ভজ-প্রফুল্ল মুখপদ্ম বিলোকনে ।  
 অতুল আনন্দ উঠে, জননীর মনে ॥  
 মৃদু মৃদু হাসি মুখে, অমৃত বচনে ।  
 স্নেহরসে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে ॥  
 হাস্যে বাৎস্যরস-প্রকাশিনী হাসি ।  
 সরলতা তোর গুণে, হইয়াছে দাসী ॥  
 আর এক হাস্য শোভা, ভাবুক-বদনে ।  
 চঞ্চলা চপলা দিশি, শোভিত সঘনে ॥  
 অথবা গগনে যেন, নক্ষত্র সম্পাত ।  
 অচির উজ্জল দীপ্তি করে অকস্মাত ॥  
 এই আছে এই নাই, এই আরবার ।  
 কতরূপ অপরূপ, ভাবের সঞ্চর ॥  
 অপর মধুব হাসি, সাধুর অধরে ।  
 পদ্মরাগমণি সম, নিষ্ক আভা ধরে ॥

স্নেহমুখে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত ।  
 হেরিয়া প্রশান্ত মন, হয় হরষিত ॥  
 এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর ।  
 ভৃগু করে জগতের, যাবৎ অন্তর ॥  
 কেবল ঘণার হাস্যে, ঘণার প্রভাব ।  
 হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব ॥

— :: —

## কাল কন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ ।

কাল-স্বতা সর্বনাশী, সংহারিণী যেই ।  
 বর্ষবরে বরমালা, দান করে সেই ॥  
 ভগ্নকালে, লগ্ন স্থির, যগ্ন সুখভোগে ।  
 শুভক্ষণে, শুভকর্ম. গণ্ডগোলযোগে ॥  
 কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু ।  
 পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥  
 এ বরের নাপিত হইবে কোন জন ।  
 আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥  
 সূচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল ।  
 তাহাতে চড়িল বর, বারো চক্রপাল ॥

প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর ।  
 ধূমকেতু হোয়েছিল, মাথার চৌপর ॥  
 অধ উর্দ্ধ জাঁতি কিবা, মাঝে তার ফাঁক ।  
 সেই ফাঁকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক ॥  
 অপরূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ ।  
 চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥  
 এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয় ।  
 বরষা সয়েছে জল, ত্রিভুবনময় ॥  
 কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে ।  
 ধরিয়া বরণডালা, স্ত্রী-অচার করে ॥  
 কত জাঁক বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে ।  
 কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে সূখে ॥  
 সুরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া ।  
 করেছে কোতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ॥  
 রীতিমত সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া ।  
 ঘুরিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া ॥  
 তারা, তিথি আদি করি, শালা শালী যারা ।  
 কাণ্ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তারা ॥  
 হার একি অপরূপ, যাই বলি হারি ।  
 শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা ভারি ॥  
 কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বারি ।  
 শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হারি ॥

বসন্ত কুলঙ্গী শেষ, করিয়া প্রচার ।  
 ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার ॥  
 কুটুম্ব অন্ন, পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে ।  
 এসেছিল বিয়ে দিতে, বয়যাত্রী হোয়ে ॥  
 রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।  
 সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্ত্রিত ॥  
 আমাদের পরমায়ু, কোরে জলপান ।  
 একে একে সকলেই, করিল প্রশ্নান ॥  
 ওলাউঠা, বিকার, বসন্ত আর জ্বর ।  
 আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর ॥  
 এরা সব রবাহত, কত পালে পালে ।  
 হোয়েছিল রেয়ো ভাট, বিবাহের কালে ॥  
 ভাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া ।  
 আশীর্বাদ কোরে গেল, সন্তোষ হইয়া ॥  
 বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর ।  
 মাচ্ নিয়া ষরে গিয়া, বউভাত কর ॥  
 একা তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা ।  
 দেখো যেন বরে বরে, নাহি হয় দেখা ॥

---



তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান,  
 বিদীর্ণ হইত প্রাণ,  
 পাষণ বলিয়া সুধু সহিছে ॥

কেমন কর্মের সূত্র, সলিলে ডুবিল পুত্র,  
 আমার সমান কুত্র,  
 অভাগিনী বুঝি আর নাই হে ।

সবে মাত্র এক কণ্ঠে, মা বলিতে নাহি অণ্ঠে,  
 এক দিবসের জণ্ঠে,  
 সে মুখ দেখিতে নাহি পাই হে ॥

সদাই স্বভাবে মত্ত, না লও উমার তত্ত,  
 বুঝেছ কি গুঢ়তত্ত,  
 কি ক্হিব তুমি হও স্বামী হে ।

অচল অচল অতি, পাষণ পাষণমতি,  
 কি হবে দুর্গার গতি,  
 জেতে নারী যেতে নারি আমি হে ॥

দুহিতা দুখিনী যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,  
 রাজ্য হউক ছার খার,  
 কিছুতে না সাধ আছে আর হে ।

শিবের সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অন্তর্জল,  
 আহার যুতুরা ফল,  
 বিবতল বাসস্থল সার হে ॥

অগ্নিলাগা ভাল ভাল, নাম কাল কাল-কাল,



নাহি মানে কালাকাল,  
 চিরকাল সুখে কাল কাটে হে ।  
 একভাবে সদা আছে,      তৈরব বেতাল পাছে,  
 তাল দেয় কাছে কাছে,  
 তালে তালে নাচে নানা ঠাটে হে ॥  
 একি পাপ পাই তাপ,      ভূষণ বনের সাপ,  
 কোথা মাতা কোথা বাপ,  
 ভাই বন্ধু সব বৃষ্টি মোরেছে ।  
 গৃহযোত্র গোত্র গাঁই,      কিছুর ঠিকানা নাই,  
 বিষয়ের মধ্যে ছাই,  
 একেবারে তাই সার কোরেছে ।  
 পরিধান ব্যাঘ্রছাল,      শিরে কটা জটাজাল,  
 চক্ষু লাল মহাকাল,  
 আপনি বাজায় গাল সুখে হে ।  
 দারুণ পাগল শূলী,      স্বক্বেতে ভিক্ষার বুলি,  
 হুহাতে মড়ার খুলি,  
 আগম নিগম পড়ে মুখে হে ॥  
 কি বলিব বিধাতায়,      বিড়ম্বিল জামাতায়,  
 ভাসাইল হুহিতায়,  
 দারুণ হুঃখের সিন্ধুজলে হে ।  
 পিতামহ বল যারে,      পিতামহ বলে তারে,  
 ধিক্ ধিক্ দেবতারে,

কি বলিয়া দেব-দেব বলে হে ?  
 তুল্যবোধ রাগারাগ, স্তবে নাহি অনুরাগ,  
 কুবাক্যে না করে রাগ,  
 ভালমন্দ কিছু নাহি জানে হে ।  
 শ্মশানে শ্মশানে যায়, ভূত প্রেত সঙ্গে ধায়,  
 ছাইভস্ম মাথে গায়,  
 কাঁদে হাসে হরিগুণ গানে হে ॥  
 রাণী যত বাণী ভাষে, মনের আক্ৰমণ নাশে,  
 অঙ্গিনাথ শুনে হাসে,  
 অবিদ্যার অবজ্ঞা ঈশানে হে ।  
 প্রভাবে প্রকাশ দিবা, এক আত্মা শিবশিবা,  
 রাণী তা বুঝিবে কিবা,  
 সারমর্শ্ব বেদে নাহি জানে হে ।  
 সমবোধ শিবাশিব, যার নামে তরে জীব,  
 জামাতা সে সদাশিব,  
 মহামাণ্ড দেব অগ্রভাগে হে ।  
 হেসে কহে গিরিবর, মেনকা বচন ধর,  
 শিবনিন্দা তবে কর,  
 দক্ষযজ্ঞ মনে কর আগে হে ।

## বর্ষার নদী ।

---

ঐশ্বের প্রতাপবলে,      পূর্বে ছিল ধরাতলে,  
কুশা নদী বালিকার প্রায় ।  
না ছিল রসের রঙ্গ,      ধূলায় ধূষর অঙ্গ,  
তরঙ্গের রসহীন তায় ॥  
রাজ্য হলো বরষার,      জীবনে যৌবন তার,  
পরোধর প্রভাবে সঞ্চার ।  
হেলে হেলে চলে যায়,      বিপুল লাষণ্য তার,  
সলিলে স্মৃথের নাহি পার ॥

---

## বাবু ঙ্কারকানাথ \* \* \* মৃত্যু ।

যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ,      সকলি তোমার ভক্ষ্য,  
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাঁই ।  
ভয়ানক নাম মৃত্যু,      শুনিলেই হয় মৃত্যু,  
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই ?  
নাশিতেছ এই বিশ্ব,      অথচ না হও দৃশ্য,  
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর ।

মুক্ত কেবা তব হাতে,      যুক্ত সদা তীক্ষ্ণ দাঁতে,  
 মুরহর ধাতা মুরহর ॥

গজ গাভী উষ্ট্র হয়,      কিছুই অখাদ্য নয়,  
 সমুদয় করিতেছে গ্রাস ।

দয়ার দর্পণে মুখ,      নাহি দেখ একটুক,  
 ধর্ম হয়ে ধর্ম-কর্ম নাশ !

খরতর বেগধর,      লম্বোদর রত্নাকর,  
 নিরন্তর তরঙ্গ গভীর ।

ভগ্ন করি ছুই পাড়,      খেয়ে তার মাংস হাড়,  
 গুচ্ছ কর সমুদয় নীর ॥

দৃশ্য মাত্র হয় হর্ষ,      গগন করিছে স্পর্শ,  
 ধরাধর বহু সুখদাতা ।

তুমি তারে ভাব তুচ্ছ,      ছুই কর কর উচ্চ,  
 ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা ॥

গহন কানন যত,      ক্ষণমাত্রে কর হত,  
 দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে ।

নাহি রাখ অবয়ব,      উদরায় স্বাহ সব,  
 ব্যাব্র-আদি জন্তু খাও ধোরে ॥

যত সব পক্ষীকৃত,      তব গ্রাসে আছে ধৃত,  
 মৃত হয় স্থিত নহে কেহ ।

তঞ্চ করি পঞ্চভূতে,      তুমি যেন পাও ভূতে,  
 ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ ॥

অগোচর বস্তু যারা, তোমার গোচর তারা,  
বিকট বদন ছাড়া নয় ।

গরায় করিয়া বাস, ভূত প্রেত কর নাশ,  
কিছুতেই অরুচি না হয় ।

ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জ্বর জ্বর,  
থর থর কাঁপে নরগণ ।

সে রাক্ষস তব আগে, রেণু তুল্য কোথা লাগে,  
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ ॥

রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি,  
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার ।

তুমি তার সব বংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,  
একেবারে করিলে আহার ॥

রক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে,  
কত খেলে নাহি তার লেখা ।

তবেতো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি,  
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা ॥

কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে,  
কুরুকুল পাণ্ডুকুল যত ।

কুশলের শেষ করি, মুষলের বেশ ধরি,  
যত্নকুল করিয়াছ হত ॥

সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল,  
দাঁড়াইয়া গিজিনীর গেটে ।

ষর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়া বন,  
 মাটি শুক্ক পুরিয়াছ পেটে ।  
 লাহোরে সমরস্থলে, শাদা কালো দুই দলে,  
 সে দিনেতে করিয়া নিধন ।  
 টুপি কুর্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গৌপ,  
 সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥  
 বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জন্তু নানা,  
 কত খেলে সংখ্যা নাহি তার ।  
 কেবল খাবার ধুম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম,  
 মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥  
 শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, বড়ঝতু পরিবার,  
 সমুচয় পেটে দেয় পূরে ॥  
 আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার,  
 সবে বন্ধ কাল তব পূরে ।  
 ছাই ভয় যাহা পাও, সকলি গুবিয়া খাও,  
 দেখে শুনে হারা হই দিশে ।  
 দিবানিশি চলে মুখ, শ্রান্তি নাই একটুক,  
 এত খেয়ে পাক পার কিসে ?  
 কন্যাপুত্র বন্ধু ভ্রাতা, জাতি আদি পিতা মাতা,  
 শোকাকুল প্রতি জনে জনে ।  
 ত্রিসংসার ছারখার, অনিবার বারিধার,  
 বিধবার নীরদ নরনে ॥

কিছুতেই নহে তুই, নিয়ত বদন রুই,  
হুই ক্ষুধা কেমন প্রবল ।

নদ নদী খাও তবু, নির্বাণ না হয় কভু,  
প্রজ্বলিত জঠর অনল ॥

পল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদ্য,  
মত্ত সদা খাদ্য গুণ গেরে ।

বার বার বারষোগে, পুষ্ট তবু হুষ্টভোগে,  
মাস মাস মাস মাস খেয়ে ॥

ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম,  
অধম না দেখি আর হেন ।

দেখা পেনে বিধাতার, বিশেষ স্মৃধাব তাঁর,  
তোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥

পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে,  
দূর দূর পাপী ছরাচার ।

এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকানাথে,  
তবু তুই করিলি আহার ॥

গুণে বশ দিগ্‌দশ, গান করে যার যশ,  
কাল তুই কাল হলি তার ।

এই দেখ সবে ক্ষুধ, হয়ে স্বীয় শোভাশূন্য,  
জগৎ করিছে হাহাকার ॥

## প্রেম-নৈরাশ্য ।

যার তরে আকুঞ্চন,            করিয়া কাতর মন,  
এ অবধি না হইল স্থির ।  
তাহারে এখনো আর,    আশা আছে পাইবার,  
আরে মুগ্ধ মানস অধীর ॥  
পূর্বে যদি দৈবাধীন,    দেখা হতো কোন দিন,  
উভয়ের হাসিত নয়ন ।  
এখন হইলে দেখা,        নাহি পূর্ব-প্রেমরেখা,  
হেঁট করে বিনোদ বদন ॥  
হেরে সে বিমল মুখ,        নয়নে উপজে সুখ,  
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে ।  
সে সুখদ শশধর,        সশুদ্ধিত নিরন্তর,  
গুরুপরিবাদ রাহুভয়ে ॥  
হবেনা হবার নয়,        মনেতে নিশ্চয় হয়,  
তবে কেন মিছে আশা ভ্রমে ।  
অধীর মানস মম,        হয়েছে বধির সম,  
প্রবোধ মানেনা কোন ক্রমে ॥

---



## প্রেম ।

যথার্থ প্রেমের পথে, পেথিক যে জন ।  
নির্মল জলের প্রায়, স্নিগ্ধ তার মন ॥  
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে ।  
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে ॥  
সরল স্বভাবে পায়, সন্তোষের সুখ ।  
ভ্রমে কভু নাহি দেখে, ছলনার মুখ ॥  
রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে ।  
ভুবন ভুলায় নিজ, প্রণয়ের বশে ॥  
ভাব তুলি স্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে ।  
মিত্ররূপ চিত্র করে, হৃদয়ের পটে ॥  
সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভালবাসা ।  
মানস বৃক্ষেতে তার, মনোহর বাসা ॥  
প্রতিক্রম প্রতীক্রম, অনুরাগ ফলে ।  
পড়া পাখী না পড়াতে, কত বুলি বলে ॥  
অঁাখির উপরে পাখী, পালক নাচার ।  
প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচার ॥  
প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাসি মনে ।  
আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় সদনে ॥

পোষমানা পড়া পাখী, দরিদ্রের ধন ।  
 সাবধানে রাখি কত, করিয়া যতন ॥  
 পোড়া লোকে পাপচক্রে, দৃষ্টি করে তারে ।  
 আর আমি কোনমতে, দেখাবনা কারে ॥

---

### প্রণয়ের প্রথম চূষন ।

প্রণয় সূখের সার, প্রথম চূষন ।  
 অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকের ধন ॥  
 আছে বটে অমৃত, অমরাবতী পুরে ।  
 প্রেমোদ্ভিত করে যাহে, যত সব সুরে ॥  
 উথলয় সূখসিকু, পানে এক বিন্দু ।  
 যার আশে গ্রাসে রাহ, পূর্ণিমার ইন্দু ॥  
 সে ক্ষুধার সূধা মাত্র, নাহি একক্ষণ ।  
 যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চূষন ॥

---

অশূরের প্রিয় পেয়, সুরারস মাত্র ।  
 রসনা সরস গাত্র, পরশিলে পাত্র ॥  
 যার লাগি হলো ধ্বংস, বহুবংশগণ ।  
 স্বভাবে অভাব সদা, রেবতীরমণ ॥

অদ্যাবধি সদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান ।  
 বিদ্যাজন খাদ্য মাঝে, সদ্য বিদ্যমান ॥  
 এমন মধুরা সুরা, নাহি চায় মন ।  
 যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চূষন ॥

অমল কমল সম, কবিতার শোভা ।  
 ভাবকের মন তাহে, মত্ত মধুলোভা ॥  
 দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা, ভাবকের মন ।  
 কবিতায় তৃপ্ত তথা, হয় সর্বজন ॥  
 বাহার প্রসাদে পরিহত, পুত্রশোক ।  
 পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক ॥  
 হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন ।  
 যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চূষন ॥

গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক-আকর ।  
 রক্ত কাঞ্চনময়, সুরমেরু শেখর ॥  
 নানা রত্ন পরিপূর্ণ, রত্নাকর জলে ।  
 গজমুক্তা মূল্যযুক্তা, অনেক সিংহলে ॥  
 কুবের লইয়া যদি, এই সমুদয় ।  
 আমারে প্রদান করে, হইয়া সদয় ॥  
 ক্ষেপণ করিব দূরে, প্রহারি চরণ ।  
 যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চূষন ॥

তন্ন মন্ন পুরাণাদি, সৰ্ব্বশাস্ত্রে শুনি ।  
 পুন পুন এই বাক্যে, কহে যত মুনি ॥  
 ইহধরা ছুখভরা, অসার সংসার ।  
 নহেক তিলেক সুখ, সুধার সঞ্চার ॥  
 মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, এইস্থলে ঘটে ॥  
 নতুবা অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে ॥  
 দেখাইব কত সুখ, এ তিন ভুবন ।  
 যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষন ॥

নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন ।  
 সুমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ ॥  
 হৃদয়ে আনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন ।  
 সহস্র সহস্র সুখ, প্রাপ্ত হয় মন ॥  
 রসনার রসবারি, খর স্রোতে বর ।  
 শিহরে সৰ্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ, দেয় লজ্জাভয় ॥  
 এইরূপ স্বৰ্গভোগ, লভি সৰ্ব্বক্ষণ ।  
 যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষন ॥

## প্রণয় ।

বহুদিন যার লাগি, হরে প্রেম-অমুরাগী,

আশাপথে আশা ছিল একা ।

সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,

গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥

নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গি,

সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ ।

স্বভাবে স্বভাববশে, যশযুক্ত নিজ যশে,

স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ ॥

ভাবের করিয়া সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি,

দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে ।

কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা,

নয়নের পলকে পলকে ॥

বিশ্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,

বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে ।

পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জর জর,

নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥

মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই,

ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে ।

প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,  
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে ।

থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,  
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে ।

চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্ধফোটা পদ্মফুল,  
পবনহিলোলে যেন দোলে ॥

তুলনা তুলনা তার, তুলনা কি আছে আর,  
সে রূপের নাহি অনুরূপ ।

হাস্তভরা আশ্রুখানি, গলিত অমৃত বাণী,  
ললিত লাবণ্য অপরূপ ॥

কলেবর কমণীয়, নহে কাম গণনীয়,  
রতির সে রমণীয় নয় ।

ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,  
শ্রিয় হেরে শ্রিয়মান রয় ॥

অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,  
আশা চায় উভয়ের আশা ।

দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাই যুক্ত তথা,  
হৃদয়েতে মাধুর্যের বাসা ॥

বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,  
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে ।

বিপক্ষেই দুষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষ্কিয়াছে,  
তুষিয়াছে সস্তোষেরে স্মৃতে ॥

আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,  
গলিয়াছে স্নেহ রস নিয়া ।

মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,  
বাঁধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়া ॥

দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ,  
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে ।

এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে,  
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে ॥

আমারে বিনয় করি, হুঁতী হাতে হাতে ধরি,  
দেখা যায় ওই যায় চোলে ।

রাহ তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশী গেল গ্রাসি,  
হাসি হাসি আসি আসি বোলে ॥

হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি অঁথিজলে,  
এসো এসো কোন্ মুখে বলি ।

নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে,  
মনের আঙুনে শুদ্ধ জলি ।

তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,  
আমি আমি কব আর কারে ?

সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কর,  
আমার কহিব আমি তারে ॥

সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,  
অমঙ্গল কপালে আমার ।

উদ্দেশে ঔদাস্য লয়ে,      চাতকের মত হয়ে,  
    আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥  
 সে যখন মনে জাগে,      কিছু নাই ভাল লাগে,  
    ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বনি ।  
 স্থির নহি ঋণমাত্র,      চিন্তাপূর্ণ চিত্ত পাত্র,  
    গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি ॥  
 সে যদি প্রেমিক হয়,      প্রেমের দরদ লয়,  
    দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি ।  
 এবার পাইলে দেখা,      সূখের না হবে লেখা,  
    রেখা দিয়া একা কোরে রাখি ॥

## প্রণয়ের আশা ।

কত আর রব তার, আসা আশা লোয়ে ?  
 দিন দিন তনু ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥  
 সদা যার স্নেহভার, শিরে মরি বোয়ে ।  
 আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে ?  
 একাকী রোদন করি, এক স্থানে রোয়ে ।  
 বিরহ বাতনা আর, কত রব সোয়ে ?  
 বুঝি তার আশাপথে, গরিপূর্ণ সূখ ।  
 কখনো জানে না মনে, নিরাশার ছথ ॥



প্রথম না হলে পরে, দেখা দিত ফিরে ।  
 আমারে ভাসাবে কেন, নিরাশার নীরে ?  
 প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা ।  
 সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা ॥  
 আশা দিয়ে বাসা দিয়ে, রাখিয়াছে বেঁধে ।  
 আমার ভাবিয়া আমি, বুঝা মরি কেঁদে ॥  
 বুঝেনা অবোধ মন, প্রবোধ না মানে ।  
 আমার বলিয়া তারে, নিতান্ত সে জানে ॥  
 সবে তার এক মন, এক ঠাই বাঁধা ।  
 ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে বাঁধা ॥  
 হোক হোক তার হোক, সুখী আমি তাতে ।  
 আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে ?  
 যদি না আসিবে সেই, বাঁধাশ্রমে ছেড়ে ।  
 ছলেতে আমার মন, কেন নিলে কেড়ে ?  
 যখন বিরলে সেই, বোসে রবে একা ।  
 এই কথা বোলো তারে, হলে পরে দেখা ॥  
 বিধিমেতে তোমার, মঙ্গল যেন হয় ।  
 মঙ্গল তোমার পক্ষে, ~~এ~~ পক্ষেতো নয় ॥  
 ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে সুখেতে আছি ।  
 ছাড়া হয়ে কাড়ামন, ফিরে পেলো বাঁচি ॥  
 বুঝারে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে ।  
 একবার দেখা দিয়ে, মন দেয় ফিরে ॥

## বিলাতের টোরি ও হুইগ ।

কিছুমাত্র নাহি জানি, রায় রাম হরি ।  
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টোরি ॥  
হুইগ কাহারে বলে, কেবা তাহা জানে ।  
হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাণে ॥  
টোরি আর হুইগের, যে হন প্রধান ।  
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান ॥  
ওণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই ।  
ওধু স্মিচার চাই, ওধু স্মিচার চাই ॥  
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ।  
ওধু স্মিচার চাই ॥

---

নিতান্ত অধীন দীন, এদেশের লোক ।  
লক্ষ্মীহীন অতি ক্ষীণ, সদা মনে শোক ॥  
রাজ্যের মঙ্গল হেতু, ব্যাকুল সকল ।  
প্রীতিকণ প্রীতিকণ, রাজার কুশল ॥

চাঁতকের ভাব যথা, জলদের প্রীতি ।  
 সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি ॥  
 যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই ।  
 শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥  
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ॥  
 শুধু সুবিচার চাই ॥

চারিদিকে যুদ্ধের, অনলরাশি জলে ।  
 নির্ঝাণ করছ বিড়, সন্ধিরূপ জলে ॥  
 রণরঙ্গে প্রাণী নাশ, বিবাদের হেতু ।  
 বিবাদ-সাগরে বান্ধ, ঐক্যরূপ সেতু ॥  
 সন্ধিবোধে দান কর, শান্তিগুণ রস ।  
 পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ ॥  
 প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাঁই ।  
 শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥  
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ॥  
 শুধু সুবিচার চাই ॥

পরিবর্ত কর সব, নিয়মের দোষ ।  
 যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ ॥  
 জন্ম কর্ম ধর্ম রীতি, জাতি আর দেশ ।  
 কোন রূপ কোন পক্ষে, নাহি থাকে দোষ ॥

নির্মল ময়নে কর, কৃপাদৃষ্টি দান ।  
 একভাবে ভাব মনে, সকল সমান ॥  
 মানসিক সব কার্যে, স্নেহ যেন পাই ।  
 শুধু স্মৃতিচার চাই, শুধু স্মৃতিচার চাই ॥  
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ।  
 শুধু স্মৃতিচার চাই ॥

---

হুজুর তরুর তরে, ভীত লোক সব ।  
 চারিদিকে উঠিয়াছে, হাহাকার রব ॥  
 মনীষ্যে খাতাপত্র, জমীদার যারা ।  
 নীলামের শত্রু দায়ে, মারা যায় তারা ॥  
 শমনের সহোদর, নীলকর যত ।  
 ধনে প্রাণে প্রজাদের, হুখ দেয় কত ॥  
 অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাই ।  
 শুধু স্মৃতিচার চাই, শুধু স্মৃতিচার চাই ॥  
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ।  
 শুধু স্মৃতিচার চাই ॥

---

## প্রভাতের পদ্য ।

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,  
সে রূপের নাহি অনুরূপ ।

নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,  
প্রকাশ করেছে নিজ রূপ ।

মাথার আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,  
হেসে হেসে কি খেলা খেলায় ।

আহা কি বা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,  
স্নেহে তার বদন মুছায় ॥

নেচে নেচে ক্রমে ক্রমে, হেটমুখে পড়ে বনে,  
মনে এই ভাবের আভাষ ॥

কমল দলের তলে, রবি-ছবি জলে জলে,  
বিদূরিত হোতেছে বিলাস ॥

দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,  
ছোট ছোট কমলের কলি ।

মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,

\* \* \*

মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,

এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর ।

মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,

লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥



## কবি ।

চিত্রকর চিত্র করে, করে তুলি তুলি ।

কবিসহ তাহার তুলনা, কিসে তুলি ?

চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব ।

তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব ॥

ফলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ ।

কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ ॥

চারু বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কবি ।

স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি ॥

কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট ।

অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥

ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস, আদি বহুতর ।  
সমুদয় চিত্রকরে, কবি চিত্রকর ॥  
পটুয়ার চিত্র ক্রমে, রূপান্তর হয় ।  
কবি-চিত্র কি বা চিত্র, বিনাশের নয় ॥  
পটুয়ার লেখে কত, হাত, মুখ, পদ ।  
কবি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥  
পদে পদে সেই পদে, কত হাত মুখ ।  
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় হৃথ ॥  
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা ।  
ভাবনীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা ॥  
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন ।  
ভাবরসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥  
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা ।  
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা ॥  
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি ।  
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি ॥

---

## মাতৃভাষা ।

মায়ের কোলেতে গুয়ে,      উরুতে মস্তক খুয়ে,  
খল খল সাহাস্য বদন ।

অধরে অমৃত করে,      আধো আধো মৃৎস্বরে,  
আধো আধো বচনরচন ।

কহিতে অস্তুরে আশা,      মুখে নহি কটুভাষা,  
ব্যাকুল হোয়েছ কত তার ।

মা-স্বা-মা-মা-বা-ব্বা বা-বা,      আবো, আবো, আবা, আবা,  
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥

ক্রমেতে কুটিল মুখ,      উঠিল মনের সুখ,  
একে একে শিথিলে সকল ।

মেসো, পিশে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,  
স্থল, জল, আকাশ, অনল ॥

ভাল মন্দ জানিতেনা,      মলমূত্র জানিতেনা,  
উপদেশ শিক্ষা হোলো বত ।



পঞ্চমেন্তে হাতে ধড়ি,      খাইয়া গুরুর ছড়ি;

পাঠশালা পড়িয়াছ কত ।

ঘোবনের আগমনে,      জ্ঞানের প্রতিভা মনে;

বস্তু বোধ হইল তোমার ।

পুস্তক করিয়া পাঠি,      দেখিয়া তবের নাট;

হিতাহিত করিছ বিচার ॥

যে ভাষায় হোরে শ্রীত;      পরমেশ-শ্রুণ-গীত,

বৃদ্ধকালে গান কর মুখে ।

মাতৃ সম মাতৃভাষা,      পুরানে তোমার আশা;

তুমি তার সেবা কর মুখে ॥



## স্বদেশ ।

জাননা কি জীব তুমি,      জননী-জনমভূমি;

যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ।

ধাকিয়া মায়ের কোলে,      সন্তানে জননী ভোলে,

কে কোথায় এমন দেখেছে ?

ভূমিতে করিয়া বাস,      ঘূমেতে পুরাও আশা;

জাগিলে না দিবা বিভাবরী ।

কত কাল হরিয়াছ,      এই ধরা ধরিয়াছ,

জননী-জঠর পরিহরি ॥

যার বলে বলিতেছ,                      যার বলে চলিতেছ;

যার বলে চলিতেছ দেখ ।

যার বলে তুমি বলি,                      তার বলে আমি বলি,

ভক্তি তাবে কর তারে সেই ॥

এহুতী তোমারে যেই,                      তাহার এহুতী এই;

বসুমতা সত্য সত্যকার ।

কে বলে কিতির রীতি,                      তোমার জননী কিতি,

জনকের জননী তোমার ॥

কত শস্য কলমূল,                      না হয় বাহার মূল;

হীরকাদি রজত কাঞ্চন ।

বাঁচাতে জীবের অঙ্গ,                      রক্ষেতে বিপুল বঙ্গ,

বসুমতী করেন ধারণ ॥

সুগভীর রক্ষাকর,                      হইয়াছে রক্ষাকর,

রক্ষমণী বসুধার বরে ।

শূন্যে করি অবস্থান,                      করে করে কর দান,

তরণি ধরণীরানী-করে ॥

ধরিয়া ধরার পদ,                      পেরে পদ নদী, নদ,

জীবনে জীবন রক্ষণ করে ।

মোহিনী মহীর মোহে,                      বহি বারি বহু দৌহে,

শ্রেয়সাথে চরে চরাচরে ॥

শ্রেয়তির পূজা ধর,                      পূজকে শ্রেয়াম কর,

শ্রেয়মণী পৃথিবীর পদে ।

বিশেষতঃ নিঃসন্দেহে,      শ্রীতি রাগ সর্বিশেষে,

মুগ্ধ কীর যার মোহমদে ।

ইন্দ্রের অমরাবতী,      ভোগেতে না হয় মতি,

স্বর্গভোগ উপসর্গ সার ।

শিবের কৈলাসধাম,      শিবপূর্ণ বটে নাম,

শিবধার স্বদেশে তোমার ॥

বিছা মণি মুক্কা হয়,      স্বদেশের প্রিয়শ্রেয়,

তার চেয়ে রত্ন নাই আর ।

সুধাকরে কত সুখা,      দূর করে কৃষ্ণা সুখা,

স্বদেশের গুণ সমাচার ॥

লাতুভাব ভাবি মনে,      দেখ দেশবাসীগণে,

প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া ।

কতরূপ স্নেহ করি,      দেশের কুকুর ধরি,

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

স্বদেশের প্রেম বত,      সেই মাত্র অবগত,

বিদেশেতে অধিবাস যার ।

ভাব তুলি ধ্যানে মরে,      চিত্তপটে চিত্র করে,

স্বদেশের সরল ব্যাপার ।

স্বদেশের শাস্ত্রমতে,      চল সত্য ধর্মপথে,

সুখে কর জ্ঞান আলোচন ।

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা,      পূরাও তাহার আশা,

দেশে কর বিদ্যাভিভরণ ॥





